সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ

(Free Internet Edition. You can download it and read it for free. Distribution or publishing for commercial purposes is prohibited.)

মাওলানা কবির আহমদ খান
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ

মাওলানা কবির আহমদ খান
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশক: আলহাজ মুহাম্মদ জাকির হুসাইন (রুনু)

প্রথম প্রকাশ:
মার্চ, ২০১০ ঈসায়ী, রবিউল আওয়াল ১৪৩১ হিজরী

(গ্রন্থ প্রণেতাদ্বয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য: ৬০.০০ টাকা।

বিক্রয়কেন্দ্র:
মদীনা ভবন
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

"**Salfe Saliheen o Ilme Tasawwuf**" by Maolana Kabir Ahmad Khan and Engineer Azizul Bari, published by Alhaj Md Zakir Hussain (Runu), March 2010
Price: Tk. 60.00; £2.00

উৎসর্গ

আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদ্বয়, কুতবে যামান হযরত মাওলানা
আমীন উদ্দীন শাখয়ে কাতিয়া (রাহ.) এর রূহের প্রতি ও
প্রখ্যাত তাফসীরবিদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী (দাঃবাঃ)- এর হায়াতে তায়্যিবাহ
এবং
শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রাহঃ) এর বিশিষ্ট খলীফা তাফসীর বিশেষজ্ঞ আল্লামা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা (রাহ:)-সহ মৃত ও
জীবিত সকল মহাত্মন অলি-আউলিয়া ও তাসাওউফের খিদমাতগারদের
মাগফিরাত কামনায়।

"সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, মানুষের একটি শ্বাসও যদি আল্লাহর স্মরণ ছাড়া বেরিয়ে যায় তাহলে তা কুফরী অবস্থায় বের হলো।" - কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

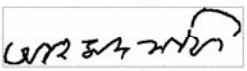
শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ) এর বিশিষ্ট খলীফা
উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলীম ও বুযুর্গ জামেয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক

আল্লামা আহমদ শফী (দা:বা:) -এর বাণী

আমার প্রিয় ভাই হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহঃ) এর বড় ছেলের জামা . আমার স্নেহভাজন মাওলানা কবির আহমদ খান ও লন্ডনের ইসলামী সমাচার ও হিজরত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর যৌথ লেখা **'সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ'** নামক পুস্তকটি আমি দেখেছি। বর্তমান যুগে এ ধরনের পুস্তকের নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা আজকের যুগে নামধারী কিছু আলিম ও দল যেভাবে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ভয় হয়, আল্লাহ না করুন আমাদের উপর কোন ভীষণ মুসিবত পতিত হয় কি না। অতীতের অসংখ্য ফকীহ, আউলিয়ায়ে কেরাম ইলমে তাসাওউফকে অনুসরণ করেছেন। এবং একবাক্যে এর গুরুত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। আজ তথাকথিত আলিম নামধারীরা কোন্ সাহসে এদের সবাইকে ভ্রান্ত বলার মতো স্পর্ধা দেখায়! এসব বাহ্যিক আলিমদের কুকর্ম ও ভ্রান্ত মতবাদ এবং অপপ্রচারকে যে কোন মূল্যে উৎখাত করে দ্বীনের আধ্যাত্মিকতার দিকটি সমুন্নত করতে হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। এই পুস্তকটি পাঠ করে তা আঞ্জাম দিতে অন্যদের অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাই। আর মহান আল্লাহর দরবারে দুয়া করি- তিনি যেন এর ওয়াসিলায় লেখকদ্বয়কে ক্ষমা করে এই পুস্তকটিকে তাদের নাজাতের ওয়াসিলা করে দেন। আর এ ধরনের আরো বিরাট খিদমাত করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

আহমদ শফি



১৯/২/২০১০

প্রাককথন

'তাসাওউফ' (تصوف) সাফা শব্দ থেকে বূৎপন্ন। যার অর্থ পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ হৃদয় মনের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে যারা সক্ষম হয়েছেন, তাঁদেরকেই পরিভাষায় সুফি বলা হয়। বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন **'সুফ'** বা পশমী বস্ত্র পরিধানকারী সাধক সম্প্রদায়কে **'সুফি'** নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সাধককুল শিরোমণি আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখশ (রাহ:) -এর মন্তব্য হচ্ছে হৃদয় মনের স্বচ্ছতা থেকে **'সুফ'** শব্দের ব্যুৎপত্তি। **'সুফ'** বা পশম পরিধানের কারণে তাঁদেরকে এই নাম দেওয়া হয় নি। মনে রাখতে হবে যে, হৃদয়-মনের পরিচ্ছন্নতা (সাফা) বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরল পুরস্কার ও নিয়ামত বিশেষ। পরন্তু সুফ বা পশমের পোশাক আল্লাহপাক চতুষ্পাদ জন্তুদের গায়েও দান করেছেন।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মনে রেখো, মানবদেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যেটির পরিশুদ্ধি হলে সমগ্র দেহই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি সেটি কলুষিত হয় তবে সমগ্র দেহ-মনই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখো এই পিণ্ডটি হচ্ছে মানুষের ক্বলব বা অন্তর। [বুখারী]

অনেকে মনে করেন, **'সফ'** শব্দ থেকে **'সুফি'** শব্দের ব্যুৎপত্তি। **'সফ'** শব্দের অর্থ **'কাতার'**। কেননা সুফিগণ আল্লাহ তা'আলার সমীপে সর্বদা প্রথম কাতারে হাজির থাকতে সাধনায় রত থাকেন।

মসজিদে নববীর **'সুফ্ফা'**র অধিবাসীগণ ছিলেন সংসারত্যাগী সাধক। সংসার জীবনের সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত রেখে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে নববীর মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত রাখতেন সুফ্ফার অধিবাসীগণ। পরবর্তীতে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে যারা সংসারত্যাগী সাধনার জীবন অবলম্বন করতেন, তাঁদেরকেই **'সুফি'** বলে অভিহিত করা হতো।

ইমাম আবু আলী রোদবারী (রাহ:) বলেছেন, সুফি সেই ব্যক্তি যিনি পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছেন। যিনি কঠিন সাধনা দ্বারা হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আদর্শবান হয়েছেন। আর পার্থিব জীবনের সকল হাতছানিকে পিছনে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আনসারী (রাহ:) বলেন, **'তাসাওউফ'** সেই ইলমের নাম যার দ্বারা অন্তরের পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। উদ্দেশ্য দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সৌভাগ্য লাভ!

তাসাওউফের উৎপত্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত ও সুন্নাহ থেকে। এই শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন, প্রিয়তম নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবাদাত-বন্দেগী এবং আত্মার উৎকর্ষতা লাভের যে সাধনা, তা-ই পরবর্তীতে **'তাসাওউফ'** নাম ধারণ করেছে। এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ থেকেই ইলমে ফিকহের উৎপত্তি। সুতরাং ইলমে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত যেমন ইসলামী জীবনযাপন সম্ভব হয় না, তেমনি তাসাওউফ অনুশীলন ব্যতীত ঈমান-ইয়াক্বীনের পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয় না। যে কারণে সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগ থেকে তত্ত্বজ্ঞানীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাসাওউফ চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাবিঈগণের যুগে এসে যেমন ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণতা লাভ করেছিল, তেমনি সুলুকের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণ রূপও এই যুগে ঘটেছিল। তাবিঈ যুগের মনীষীগণের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র জাহেরী ইলম চর্চা করেই ক্ষান্ত ছিল, তার পক্ষে যিন্দিক হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে কুরআন-হাদীসের ইলম ছাড়াই যদি কেউ তাসাওউফ চর্চায় লেগে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি চরম গোমরাহীর মধ্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই জন্যই বলা হয় যে, ইলম বিহীন কোন সালিকের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই কামালিয়াতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা নেই। যদি ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে, আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহের বশে **'ইলমে লাদুন্নী'** দান করে পরে তার মধ্যে কামালিয়াত সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম যামানা থেকেই **'মুতাজিলা'** নামক একটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সুলুকের মেহনতকে অর্থহীন সাব্যস্ত করে নানা ধরনের কূটতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাবিঈ যুগের বিখ্যাত সুফি হযরত হাসান বসরী (রাহ:) এই শ্রেণীর লোককে তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই **'তাসাওউফের'** প্রতি নানা উপহাসমূলক বক্তব্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এ ধরনের জ্ঞান-পাপীরাই সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে যে, তাসাওউফ চর্চা ইসলামের কোন মৌলিক বিষয় নয়। যার নেতিবাচক প্রভাব আলিম সমাজের একটি শ্রেণীকেও বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তাঁরা মনে করেন, তাসাওউফ চর্চা পারস্যের অগ্নিপূজার অনুসারীদের নিষ্ক্রিয় ধ্যানবাদ থেকে মুসলমানদের মধ্যে তাসাওউফের বাতি সংক্রমিত

হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রাহ:), ইমাম শাফিঈ (রাহ:), ইমাম মালিক (রাহ:) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ:) -এর জীবন সাধনা নিয়ে মনোনিবেশ করলে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণের প্রত্যেকেই ছিলেন একেকজন প্রথমশ্রেণীর সুফি।

অপরদিকে কিছুসংখ্যক মূর্খ লোক নিছক পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে সুফির রূপ ধারণ করে। এসব লোকের মুখে শোনা যায় যে, তাসাওউফ অর্জন করতে হলে দীনি ইলমের কোন প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য যে, এসব লোক চরম পর্যায়ের গোমরাহ। এরাই তাসাওউফের ন্যায় একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতিকে নানা শয়তানী কর্মকাণ্ডের দ্বারা কলুষিত করেছে। বলা বাহুল্য যে, মুসলিম উম্মার জন্য এটা একটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্তমান বাংলাদেশে বিভিন্ন **'দরবার শরীফ'** ও গদ্দির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে সেইসব শয়তানী কর্মকাণ্ডের দুর্গন্ধ অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। পাশ্চাত্যের ইহুদী-নাসারা চক্রও বর্তমানে তাসাওউফ চর্চার নামে এসব দরবার-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, বর্তমান মুসলিম উম্মার জন্য এটা একটা মারাত্মক ঈমানী বিপর্যয়ের আলামত। সম্ভাব্য এই বিপর্যয় থেকে উম্মাকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞ আলিম সমাজকে শুদ্ধ তাসাওউফ চর্চার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখি না।

বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ তাসাওউফ বিষয়ক বই-পুস্তকের খুব অভাব আছে। তাসাওউফ সম্পর্কিত বক্ষমান পাণ্ডুলিপিটি দেখে আমি স্বস্তি অনুভব করছি যে, তরুণ আলিম মাওলানা কবির আহমদ খান ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী যৌথভাবে **'সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ'** নামে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমার ধারণায় বিষয়বস্তু ও তথ্য সংযোজনে এই বইয়ে কোন ত্রুটি নাই। মনে হয় কিছু ইংরেজী বই-পুস্তক থেকেও তথ্য সংগ্রহ করার দরুন নামগুলির ব্যাপারে কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। তারপরও এটি একটি মূল্যবান বই। আশা করি এই বই পাঠ করে আগ্রহী পাঠকগণ উপকৃত হবেন।

প্রসঙ্গত একটি কথা না বললেই নয় যে, সিলেটকে বলা হয় **বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী**। হযরত শাহ জালাল ইয়ামনী (রাহ:) -সহ তিন শত ষাট আউলিয়ার চারণভূমি সিলেট। তাঁদের অধিকাংশেরই বংশধর বর্তমান সিলেটে বাস করেন। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে কুতবে আলম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ:) সিলেট ভূমিতে আধ্যাত্মিকতার যে আলো ছড়িয়ে গেছেন তার রৌশনী চারদিকে দৃশ্যমান। **'ইসলামী তাসাওউফ'** মুসলিম উম্মার বোধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক মহামূল্যবান

উত্তরাধিকার। এই সম্পদ চক্রান্তকারীদের কবল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদিগকে নিতে হবে। এই বইয়ের দুই লেখকই যেহেতু ওলী-আউলিয়াগণের বিচরণক্ষেত্র সিলেটের অধিবাসী এবং শুদ্ধ তাসাওউফের চর্চায় আত্মনিবেদিত, সে মতে বর্তমান যুগসমস্যার সৃষ্ট সমাধান তালাশ করার ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট থেকে অনেক কিছুই আশা করা যায়। দু'আ করি আল্লাহপাক লেখকদ্বয়ের এই নেক প্রয়াস কবুল করুন।

নিবেদক



(মাওলানা) মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

পেশ কালাম

হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের কর্মকে সঠিক করুন!

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রহস্য জগতের গুপ্তভেদ তাঁর অলিদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শক্তির রহস্যাবলী নৈকট্যশীলদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন এবং তাঁর মাহাত্ম্যের অসি দ্বারা প্রেমিকদের রক্ত ঝরিয়েছেন। তিনি আওলিয়াদের হৃদয়কে তাঁর উপস্থিতির স্বাধ গ্রহণ করিয়েছেন! তিনিই মৃত হৃদয়কে জ্যান্ত করেন তাঁর নিজের অবিনশ্বরতার আলোকবর্তিকা ও মাহাত্ম্য দ্বারা।

আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার পরিবর্গ আসহাব ও সম্মানিতা স্ত্রীদের উপর! [কাশফ আল-মাহযুব, অনুবাদ, আর এ নিকলসন, দারুল ইসহাত, উর্দু বাজার, করাচী, ১৯৯০, পৃঃ ১]

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম মেহেরবানীতে পাঠকদের সম্মুখে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা বা ইলমে তাসাওউফের এই পুস্তকখানি তুলে ধরতে পেরেছি। রহস্যাবৃত অথচ দ্বীনের জন্য জরুরী এই জ্ঞানের উপর বই রচনা সুকঠিন কাজ বটে। বাস্তবে পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, সমস্ত পুস্তকটিই মূলতঃ উদ্ধৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। আমাদের মতো নগণ্য ব্যক্তিদের [এবং ইলমে তাসাওউফের উপর একবারেই অজ্ঞ] নিজস্ব মন্তব্য এতে খুব অল্পই প্রকাশ করেছি। এতে প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে, তাহলে এই দুঃসাহস কেন? হ্যাঁ, দুঃসাহস তো বটেই! তবে আজকের যুগে বাহ্যিক কিছু আলিম, ফিরকা ও দল যেভাবে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ভয় হয়, আল্লাহ না করুণ আমাদের উপর কোন ভীষণ গজব পতিত হয় কি না। আর এর কারণ হলো, ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যখনই মুসলমানরা দ্বীনের আভ্যন্তরীণ দিকটি বিসর্জন দিয়েছে তখনই তারা হয়ে উঠেছে অতিলোভী দুনিয়াদার। এর ফলে ক্রমে তারা দ্বীনের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে পড়েছে। ফলস্বরূপ তাদের উপর নেমে এসেছে দৈন্যতা, হাহাকার, পরাধীনতা, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং কুফরী শক্তির নিকট নিজেদের মান-মর্যাদাহানি। আজকের বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই এসব ব্যাপার সহজে অনুধাবন করা যায়। দ্বীনের দৈন্যতার কারণ হিসেবে আমরা মনে করি তথাকথিত আধুনিকতাবাদী মুসলমানদের কর্ম, আক্বীদা, বক্তব্য, প্রচার-প্রসার দায়ী। এরা সঠিক ও দৃঢ় ঈমানদার, পরহেজগার, আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট, আল্লাহর নৈকট্যশীল মানুষ তৈরীর জ্ঞান ও পন্থাকে অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে।

যে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো, যে পথের পথিকদের কঠোর দ্বীনি সাধনার ফলে মানুষ পথভ্রষ্টতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল- সেই জ্ঞান হচ্ছে ইলমে তাসাওউফ, তথা আত্মশুদ্ধির জ্ঞান। এটা ছেড়ে কোন মতেই মানুষ তার আখলাক, ইবাদাত, ঈমানের দৃঢ়তা, শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ, দুনিয়ার ঐশ্বর্যের প্রতি অনীহা ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি জরুরী গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না।

অতীতের অসংখ্য গুণিজন, আরিফ, জাহিদ, ফকীহ, মুজাদ্দিদ, আউলিয়া, দরবেশ প্রমুখ উচ্চপর্যায়ের নৈকট্যশীল ব্যক্তিরা সুফি তরীকাকে অনুসরণ করেছেন এবং একবাক্যে এর গুরুত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। আজ কিছু কিছু তথাকথিত আলিম নামধারীরা কোন্ সাহসে এদের সবাইকে ভ্রান্ত বলার মতো স্পর্ধা দেখান? এসব বাহ্যিক আলিমদের অপতৎপরতা বর্তমানে তুঙ্গে। এদের কুকর্ম ও ভ্রান্ত বাদ-মতবাদ এবং সুফিতত্ত্ব তথা ইলমে তাসাওউফের বিরুদ্ধে অপপ্রচার যে কোন মূল্যে উৎখাত করে দ্বীনের আধ্যাত্মিকতার দিকটি সমুন্নত ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

সুতরাং আমরা মনে করি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রচুর লেখালেখি ও গবেষণার প্রয়োজন। এই পুস্তকটি উক্ত লক্ষ্যর্জনে অন্তত কিছুটা হলেও অবদান রাখবে- এটা আমাদের বিশ্বাস। আর এর ওয়াসিলায় দয়াময় প্রভু আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এটাই আশা।

বইটিতে আগেই বলেছি, বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। ইলমে তাসাওউফ যে শরীয়তবিরোধী কিছু নয় এবং সুফিয়ায়ে কেরামদের সকলেই যে শরীয়ত তথা ইসলামের মৌলিক সকল আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা এই পুস্তক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যে কোন লেখায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তবে এর মাত্রা সর্বনিম্নে রাখার চেষ্টার ত্রুটি আমরা করি নি- তথাপি, সুহৃদ পাঠকদের নিকট যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবগত করবেন। আগামী সংস্করণে এর সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হিদায়াতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিন। আ-মিন।

(মাওলানা) কবির আহমদ খান
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সিলেট, বরিউল আওয়াল ১৪৩১ হিজরী, জানুয়ারী ২০১০।

প্রথম অধ্যায়

ইলমে তাসাওউফ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পরিচিতি

তাসাওউফ (تصوف) আরবী সাফা শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা। সুফিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এর পারিভাষিক অর্থ হলো 'হৃদয়ের পরিচ্ছনা অর্জন' বা 'তাযকিয়ায়ে নফস'। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে' তাসাওউফের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে: "তাসাওউফ ১/ শব্দ ব্যুৎপত্তিগতভাবে তাফা'উলের (تفعل) ওয়াযনে মূল ধাতু সুৎফ হইতে উৎপন্ন। সূফ অর্থ পশম। আর তাসাওউফের অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। [লাবসু'স-সূফ] অতপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় কাহারো জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এইরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন।" [সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২]। তবে অধিকাংশ গবেষক এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেন নি। মোটকথা, যে রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা তথা জিকির-মুরাকাবা দ্বারা নফসের তাযকিয়া সম্ভব তাকেই বলে তাসাওউফ। আর ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধির সাধনা হয়ে আসছে।

অনেকে মনে করেন তাসাওউফ বা সুফিতত্ত্ব ইসলামের সম্পূর্ণ আলাদা একটি শাখার নাম। এ কথাটি মোটেই সত্য নয়। বাস্তবে এই মুভমেন্টের পেছনে আসল কারণ ছিলো খাইরুল কুরুন বা সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগের শেষের দিকে মুসলিম সমাজের অতি-বিলাসিতা তথা দুনিয়াদারিত্বের প্রতি বেশী আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া। সে যুগের আমীর-উমারা এবং শাসকদের মধ্যে বিলাসিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে মিতব্যয়িতা, খোদাভীরুতা, দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকা, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি গুণাবলী। সুতরাং সে যুগের খোদাভীরু মহাত্মনরা দুনিয়াবী বিলাসিতাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিতে অগ্রসর হোন। এরাই শেষ পর্যন্ত সুফিতত্ত্ব বা তাসাওউফ শাস্ত্রের জন্ম দেন। এবার তাসাওউফের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি।

দুনিয়াদারিত্বের প্রতি অনীহা

উমাইয়্যা খেলাফতকালে (৬৬১ খৃঃ - ৭৪৯ খৃঃ) ধন-সম্পদের প্রতি অতি-আকর্ষণ ও দুনিয়াদারিত্ব চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এর পূর্বে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ ছিলো এর বিপরীত। সে সময়ে স্বয়ং খলীফা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মাকর্ষণ ও ধর্মকর্মই ছিলো জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তারা আখিরাতের জীবনকে তথা আল্লাহপ্রাপ্তিকে ইহকালের মূল লক্ষ্যে পরিণত করেন। বলাই বাহুল্য, এটাই ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা।

মুসলমানদের ইহলৌকিক আকর্ষণ চরমে উঠেছে দেখে অনেকেই যারা ধার্মিক ছিলেন, অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো দুনিয়াদার হয়ে যায় কি না। তাই তাঁরা একটি বিপ্লবের জন্ম দেন যাকে বলা হয় - সুফিতত্ত্ব।

এ সময়ের প্রসিদ্ধ কয়েকজন সুফি

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) [মৃঃ ৭২৮ খৃঃ]

তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের প্রসিদ্ধ সুফিদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে এই দুনিয়ার চাকচিক্য ও লুকানো খারাপ আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকার তাগিদ দেন। ফকীরী জীবন পালনের প্রতি তিনি উৎসাহ দেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর নৈকট্য হাসিলই হলো মানবজীবনের আসল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যর্জনে সর্বাপেক্ষা বড় বাঁধা হচ্ছে দুনিয়া তথা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রাহঃ) [মৃঃ ৭৭৭ খৃঃ]

তিনি বলখের বাদশাহী পরিত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় জীবন কাটান। প্রসিদ্ধ এই মহাত্মন তাঁর শাগরিদেরকে মুরাকাবা, নির্জনবাস, প্রার্থনার সময় নীরবতা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন।

হযরত শাকিক বলখী (রাহঃ) [মৃঃ ৮১০]

তিনি বলতেন, একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি দিলের মধ্যে পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল) সৃষ্টি করা যেতে পারে। এছাড়া একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ ছাড়া হালের মাকামে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আল-মুহাসিবী বাগদাদী (রাহঃ) [মৃঃ ৮৩৭ খৃঃ]

তিনি শিক্ষা দিতেন যে, আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-পরীক্ষা ছাড়া আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য হাসিল সম্ভব নয়।

হযরত যুননুন মিশরী (রাহঃ) [মৃঃ ৮৫৯ খৃঃ]

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর মধ্যে বিলীন বা ফানাফিল্লাহ মারিফাত [আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, খোদাপ্রাপ্তির জ্ঞান] ছাড়া কখনও সম্ভব নয়। আর এই জ্ঞানার্জনের জন্যই মুর্শিদ সাব্যস্ত করে তাসাওউফের রাস্তায় নামতে হবে।

আবু ইয়াজিদ বিস্তামী (রাহঃ) [মৃঃ ৮৭৪ খৃঃ)

সুপ্রসিদ্ধ এই ওলিআল্লাহ বলতেন, আল্লাহর মধ্যে বিলীন বা ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছার পূর্বে নিজেকে বিলীন করতে হবে। আত্মবিলুপ্তির পরবর্তী স্তর হচ্ছে ফানাফিল্লাহ। তবে আত্মবিলুপ্তির জন্য চাই দুনিয়াবী যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, যশ-খ্যাতি ইত্যাদি সবকিছুর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া। তিনিই ছিলেন প্রথম 'মাতাল' সুফি। এখানে মাতাল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসায় সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। এই উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং অজান্তেই বলে ওঠেন, সুবহানী! কুল্লি ফি শানী! অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আমার জন্য! কতো মহান আমার গুপ্তভেদ!

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ) [মৃঃ ৯১০ খৃঃ]

প্রসিদ্ধ এই ওলিআল্লাহ শিক্ষা দিতেন যে, ফানা [নফসের মৃত্যু, আত্মবিলুপ্তি] ও বাকা [আল্লাহর সঙ্গে স্তিত অবস্থা] এই উভয় স্তরে উপনিত হতে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। এই জ্ঞান হলো শরীয়ত ও তরীকতের জ্ঞান।

আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহপ্রেম

সমকালীন প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ ছিলেন রাবিয়া বসরী (রাহঃ) [মৃঃ ৮০১ খৃঃ]। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহপ্রেমের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি বলতেন, আমার প্রেম-ভালোবাসা-জীবন-মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। কথিত আছে একদা বৃদ্ধ বয়সে রাবিয়া বসরী (রাহঃ) একহাতে বালতিপূর্ণ পানি আর অপরহাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে রাস্তায় দৌঁড়াতে থাকেন। মানুষ জিজ্ঞেস করলো, আপনি

এভাবে ছুটে চলছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, এই পানি দ্বারা দোযখের আগুন নেভাতে চাই আর এই মশাল দিয়ে বেহেশতকে পুড়িয়ে দেবো! সবাই এর কারণ জানতে চাইলো। জবাব এলো, যারা দোযখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে তাদেরকে থামাতে দোযখের আগুন নেভাবো আর যারা বেহেশতের আশায় আল্লাহকে ডাকে তাদেরকে থামাতে বেহেশতকে জ্বালাবো। কারণ, একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার জন্যেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

রাবিয়া বসরীর (রাহঃ) মৃত্যুর পর থেকে তাসাওউফ শাস্ত্রে আল্লাহপ্রেমের গুরুত্ব শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে প্রেম ও তাসাওউফের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়তে অসংখ্য কবিতা রচিত হয়। খোদায়ী প্রেমকে সুফি কবিরা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন।

সুফি কবিতা বিশেষকরে পারস্য অঞ্চলে স্ফুলিঙ্গের মতো ফুটে উঠে। এ যুগের অসংখ্য সুফি কবিদের মধ্যে কজন হচ্ছেন, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাহঃ), ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) (প্রাথমিক সময়ের), মুল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ), শেখ সাদী (রাহঃ), শেখ জামী (রাহঃ) প্রমুখ ফার্সি কবি।

সুফি কবিতায় প্রতীকী কিছু শব্দাবলীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষকরে খোদাপ্রেমে মত্তকে মদ, সুফির অন্তর বা হৃদয়কে মদের পাত্র এবং মুর্শিদে কামিলকে মদ পরিবেশক বা সাকী হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

তাসাওউফ ও শরীয়তের মধ্যে কথিত সংঘাত

প্রাথমিক যুগে সুফিদের শিক্ষা মৌখিকভাবে প্রচার হতে থাকে। এতে বাহ্যিক আলীম-উলামারা বেশ সন্দিহান হয়ে ওঠেন এবং সুফিদেরকে ইসলামবিরোধী এমনকি কাফির, জিন্দীক, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর ফলশ্রুতিতে দশম শতকে তাসাওউফের সঠিক তথ্যাদি তুলে ধরে একে প্রতিষ্ঠিত করতে একদল সুফি অগ্রসর হোন। একই সময় তাসাওউফ যে আসলে ইসলামের মৌলিকত্বের সঙ্গেই জড়িত সে প্রমাণ তাঁদের লেখায় প্রকাশ পায়। যারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তাঁরা হচ্ছেন: সুফি ও দার্শনিক শায়খুল আকবর আল-আরাবী (রাহঃ) [মৃঃ ৯৫২ খৃঃ], হযরত মক্কী (রাহঃ) [মৃঃ ৯৯৬ খৃঃ], আল-শাররাজ (রাহঃ) [মৃঃ ৯৮৮ খৃঃ], হযরত কালাবাদী

(রাহঃ) [মৃঃ ১০০০ খৃঃ], হযরত হুজভেরী দাতাগঞ্জে বখশ (রাহঃ) [মৃঃ ১০৫৭ খৃঃ] প্রমুখ প্রসিদ্ধ সুফিরা। তাঁরা অতীতে বড় বড় সুফি-দরবেশদের জীবনীগ্রন্থও প্রকাশ করেন।

এছাড়া আরও যারা সুফিতত্ত্বের উপর লেখালেখি করেছিলেন তাদের মধ্যে আল-কুশাইরী (রাহঃ) [মৃঃ ১০৭২ খৃঃ], ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ) [মৃঃ ১১১১ খৃঃ] এবং অন্যান্যরা। আল-কুশাইরী (রাহঃ) সুফিদের জীবনীগ্রন্থ ছাড়াও তাসাওউফ শাস্ত্রের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে 'রিসালা' নামক একটি প্রখ্যাত বই রচনা করেন। এতে তরীকতের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা [মাক্বামাত - সালিকের চেষ্টার ফল] এবং হালসমূহ [আহওয়াল- আল্লাহ প্রাপ্তির রহস্যাবৃত স্তরসমূহ] সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন।

ইমাম গায্যালী (রাহঃ) এর উপাধি হচ্ছে হুজ্জাতুল ইসলাম - ইসলামের প্রমাণ। তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ। প্রাথমিক যুগে তিনি বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মজ্ঞানের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর জ্ঞান আহরণের তৃপ্তি মোটেই শেষ হয়ে যায়নি। তাই তিনি সুফিতত্ত্বের উপর মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১১ বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে দামেস্কের উমাইয়্যা মসজিদের মিনারের নীচে অবস্থান গ্রহণ করে এখানে বসেই তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সুফিতত্ত্ব ও ইসলাম যে একই জিনিষ তা সফলভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শরীয়ত হচ্ছে গাছের খোলস আর মারিফাত বা তাসাওউফ হচ্ছে এর অভ্যন্তর। সুতরাং শুধু খোলস যেমন বৃক্ষের জন্য যথেষ্ট নয় তেমনি খোলসহীন বৃক্ষও উলঙ্গ। এ দু'য়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠে পূর্ণ বৃক্ষ। অর্থাৎ শরীয়তের আভ্যন্তরীণ দিকই হচ্ছে তরীকত।

দর্শন ও সুফিতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্কের বিকাশ

ইসলামী দর্শনের সঙ্গে তাসাওউফের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন সহল ইবনে তুসতারী (রাহঃ) [মৃঃ ৮৯৬ খৃঃ] এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত তিরমিযী (রাহঃ) [মৃঃ ৮৯৮ খৃঃ]। তবে সুফিতত্ত্ব ও দর্শনের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন হযরত ইবনে আরাবী (রাহঃ) [মৃঃ ১২৪১ খৃঃ]। মুসলিম স্পেনে তাঁর জন্ম হয়। মক্কা শরীফ ও তুনিস শহর ভ্রমণশেষে তিনি দামেস্ক শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি পাঁচ শতেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর সুফি দর্শনের মৌলিক বক্তব্য হচ্ছে ওয়াহদাতুল-উজুদ থিওরী। তিনি এতে বলেন, এ মহাবিশ্ব বা পুরো অস্তিত্বই মূলত আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ মাত্র।

অপর আরেক সুফি দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (রাহঃ) [১১৯১ সালে আলেপ্পো শহরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়]। তিনি বলেন, সবকিছুই অস্তিত্বলাভ করেছে বিভিন্ন আলো হিসেবে। আর এর মূলে আছে এবস্যুলুট বা পরম আলো অর্থাৎ আল্লাহর নূর। সুতরাং আল্লাহর নূরের বিকাশই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি।

মধ্য এশিয়ায় হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ) কর্তৃক [ত্রয়োদশ শতকে] আরেকটি সুফিদর্শনের জন্ম হয়। এই দর্শনের মাধ্যমে সুফিতত্ত্ব ও ইসলামী শরীয়তকে এক ও অভিন্ন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে মোঙ্গলদের প্রভাব থেকে সফলভাবে মুক্ত রাখা হয়েছিল।

ভারতবর্ষে হযরত আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) [মৃঃ ১৬২৪ খৃঃ] মোগল সম্রাট আকবরের পথভ্রান্ত দ্বীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে সুফি দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি বলেন, সুফিরা যে ফানার কথা বলেন তা হচ্ছে এ রাস্তার সালিকদের একটি ব্যক্তিগত অবস্থা মাত্র। অর্থাৎ সুফিদের মননে এটা একটা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা মাত্র- এটা হিন্দু দর্শনের অসীমের মধ্যে ব্যক্তির পুরো বিলীন হওয়ার বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা।

সুফি তরীকার উৎপত্তি

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে সুফি তরীকাসমূহের উৎপত্তি ঘটে। সুফিরা এসময় যে কোন সালিককে মুর্শিদে কামিলের সুহবত ও সান্নিধ্য লাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

এসময় মোঙ্গলরা চতুর্দিকে ব্যাপক হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দেশের পর দেশ জয় করে নিচ্ছিলো। এরপর বাগদাদের আব্বাসী খেলাফতও পদানত হয়। এই সংকট মুহূর্তে সুফিদের কার্যাবলী এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, অনেক ঐতিহাসিকের মতে এর ফলেই ইসলাম ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এসময় পূর্ব ও পশ্চিমে ইসলামের প্রসার যে সুফিরাই ঘটিয়েছিলেন এব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তাছাড়া তাঁদেরই চেষ্টা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ফলে শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। অনেকের মতে এই সময়টুকু ছিলো তাসাওউফের স্বর্ণযুগ।

প্রাথমিক যুগে তাসাওউফের ধারক-বাহক ছিলেন গোটা ক'জন বিশেষ শ্রেণীর উলামা-মাশায়েখ। কিন্তু এ যুগে এসে তাসাওউফ সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় বিষয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ তাসাওউফ এবং সুফিতত্ত্ব হয়ে উঠে জনপ্রিয় বিষয়। সুতরাং জনগণের জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন দাঁড়ায়। আর এরই মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিভিন্ন তরীকা। বিভিন্ন জায়গায় তাসাওউফের প্র্যাকটিসের জন্য খানকা প্রতিষ্ঠা হয়। প্রত্যেক তরীকার শায়েখ বা প্রধান এসব খানকায় অবস্থান নিয়ে সালিকদের পথপ্রদর্শন করতে থাকেন। নিজের মুর্শিদের সঙ্গে জিকির-মুরাকাবা-সামা ইত্যাদি করা ছিলো খানকার সদস্যদের মৌলিক তৎপরতা।

সে যুগে মুরীদ করার ক্ষেত্রে বিশেষ রুল-রেগুলেশন ছিলো। প্রথমে মুরীদ হওয়ার পর পুরো সদস্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে সালিককে অন্তত ৩ বছর সময় অপেক্ষা করতে হতো। ইযাযত বা খেলাফতপ্রাপ্তির সময় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুর্শিদ মুরীদকে খিরক্বা প্রদান করতেন। সুফিদের মধ্যে মুজাররদ বা অবিবাহিত থাকা শর্ত নয়। বাস্তবে অধিকাংশই বিবাহিত ছিলেন বা এখনও আছেন।

প্রত্যেক তরীকার আলাদা জিকির-আজকার-মুরাকাবা পদ্ধতি আছে। আর এই ভিন্নতাই হচ্ছে বিভিন্ন তরীকা থাকার প্রধান কারণ। বাস্তবে সব তরীকাই তাসাওউফের মৌলিক বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ এগুলো আলাদা আক্বীদা বিশ্বাস নয়। সবই একই জিনিস। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একই- আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা। একেক শিক্ষক বা মুর্শিদে কামিল একেক পদ্ধতিতে মারিফাত হাসিলের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই শিক্ষা থেকেই গড়ে উঠেছে তরীকাসমূহ।

তরীকা সৃষ্টির ফলে সাধারণ মুসলমানরা আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পান যা বাহ্যিক আলীমদের দ্বারা প্রদান করা মোটেই সম্ভব নয়। এছাড়া সূফী তরীকতপন্থীরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিরাট অবদান রাখেন। তাঁরা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য পথে যেমন, সিল্ক রোডে- পথিকদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক মুসাফিরখানা। এসব পান্থনিবাসে মুসাফিররা বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগ-সুবিধা পেতেন। বাস্তবে পীর-মুরীদী এতোই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলো যে, ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় সকল মুসলমান কোনো না কোনো তরীকার সদস্য ছিলেন।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ তরীকা

কোনো এক সমীক্ষানুযায়ী বিশ্বে দুই শতেরও বেশী তরীকা আছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে কোনো কোনোটি স্থানীয় এবং অপরগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। এবার আমরা কয়েকটি প্রসিদ্ধ তরীকা, এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

মাওলাবিয়া: প্রখ্যাত লেখক ও সুফি আল্লামা মাওলানা জালালুদ্দিন রূমী (রাহঃ) [মৃত্যুঃ ১২৭৩] হচ্ছেন এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। মাওলানা শব্দ থেকে তরীকার নাম 'মাওলাবিয়া' এসেছে। বিশ্ব বিখ্যাত ফার্সি ভাষার সুফি কবিতার গ্রন্থ 'মসনবী মা'নবী' এর লেখক হচ্ছেন আল্লামা জালালুদ্দিন রূমী (রাহঃ)। মাওলাবিয়া তরীকার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সালিকদের ঘুরে ঘুরে যিকির পড়া। কথিত আছে আল্লামা রূমী (রাহঃ) তাঁবুতে অবস্থান-কালে রাতের গভীরে জেগে ওঠে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন। যিকির-মুরাকাবার মধ্যেই তিনি তাঁবুর মাঝখানের খুঁটির চতুর্দিকে ইশকে ইলাহীর প্রচণ্ড প্রভাবে সজোরে আল্লাহর নাম লয়ে ঘুরতে থাকতেন। তাঁর এই বিশেষ অবস্থার অনুসরণেই পরবর্তীতে তাঁর তরীকার দরবেশরা ঘুরে ঘুরে যিকির পড়ার নিয়ম চালু করেন।

মাওলাবিয়া তরীকা উসমানী খেলাফত-কালে সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে বিস্তারলাভ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে মাওলাবিয়া তরীকা তুর্কি ও আশপাশের অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাইরে এর প্রভাব তেমনটি লক্ষ করা যায় না। খেলাফত ধ্বংসের পর থেকে সুফি তরীকা বা তাসাওউফ চর্চাসহ ইসলামী মৌলিকত্বের উপর তুর্কিস্তানে চরম আঘাত আসে। যার ফলে বর্তমানে মাওলাবিয়া তরীকা এখন তুরস্কে একটি আকর্ষণীয় সামাজিক রুসুমে পরিণত হয়েছে মাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগত পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে তথাকথিত 'দরবেশরা' রঙিন আকর্ষণীয় ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র পরিধান করে ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে তালে 'জিকির' করছে! পশ্চিমে মাওলাবিয়া তরীকার দরবেশরা 'ওয়ার্লিং দরবেশ' [ঘুর্ণমান দরবেশ] নামে পরিচিত।

তাযিনিয়া: মরক্কোর ফেয এলাকায় আল-তিযানী ১৭৮১ সালের দিকে এই তরীকার জন্ম দেন। খুব শীঘ্র এই তরীকা আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সিনেগাল ও নাইজেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই তরীকার সালিকদেরকে প্রতিষ্ঠিত শাসকদের হুকুম মেনে চলার শিক্ষা দেয়া হতো। এ কারণে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তরীকাটি বিস্তার

লাভ করে। বর্তমানেও এই তরীকার অনেক অনুসরণকারী বিদ্যমান আছেন। তবে মূল শিক্ষা থেকে এখন তারা অনেকটা দূরে।

দারকাবিয়াঃ মরক্কোর ফেজ অঞ্চলে মুল্লা আরবী দারকাবী (মৃঃ ১৮২৩) এই তরীকার জন্ম দেন। সাহেল, চাদ ও নিগার অঞ্চলে এই তরীকা প্রভাব ফেলে। এছাড়া অতীতে অত্র এলাকায় জিহাদী চেতনার পেছনেও এই তরীকা সক্রিয় ছিল।

খালওয়াতিয়াঃ ত্রশোদশ শতকে এই তরীকা কাকেসাস ও তুর্কীস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তরীকা উসমানী খলিফাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তরীকার প্রধান কেন্দ্রস্থল ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ তরীকার অনুসারী সুদূর মিশর ও ইন্দোনেশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়।

উপমহাদেশের ক'টি প্রসিদ্ধ তরীকা

১. চিশ্‌তিয়া

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ভারত উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি জনপ্রিয় প্রভাবশালী একটি সুফি তরীকা হলো চিশ্‌তিয়া। বর্তমান ইরানের খুরাসানের হারাত অঞ্চলে চিশত নামক একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামেই অনেকের মতে চিশ্‌তিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা আবু ইসহাক (রাহঃ) স্বীয় মুর্শিদ খাজা মুমশাদ দীন-নূরী (রাহঃ) এর নির্দেশে বসতি স্থাপন করেন। তবে চিশতীয়া তরীকা যে বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষকরে ভারত উপমহাদেশে গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন মুহাম্মাদ চিশতী (রাহঃ) এর মাধ্যমে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত হয়েছিল তা সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য। অনেকে তাঁকেই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। অবশ্য তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আরোও দু'একজন 'চিশতী' তথা চিশতে বসবাসকারী ওলিআল্লাহর নামও শোনা যায়। এদের মধ্যে বান্দাহ নওয়ায এবং খাজা আহমদ আবদাল চিশতী (রাহঃ) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ) [৫৩৩ - ৬৩২ হিজরী] ভারতে ঈসায়ী দ্বাদশ শতকে এসে আজমীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় পুরো উপমহাদেশব্যাপী চিশ্‌তিয়া তরীকার প্রসার ঘটে। সেই থেকে এই তরীকার জনপ্রিয়তা অব্যাহত আছে এবং অনেক গুণিজন এ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে চিশ্‌তিয়া তরীকার নক্ষত্রস্বরূপ ক'জন জগতখ্যাত মহাত্মন ওলিআল্লাহর নাম উল্লেখ করলেই পাঠকদের নিকট এই তরীকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ধরা পড়বে: খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহঃ) [মৃ: ৬৩৩ হিজরী], তিনি ছিলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ) এর খলীফা, দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকট তাঁর মাজার অবস্থিত; ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রাহঃ) [মৃ: ৬৬৮ হিজরী], তাঁর মাজার পাঞ্জাবের পাকপটন নামক স্থানে অবস্থিত; খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রাহঃ) [মৃ: ৭২৫ হিজরী], তাঁর মাজার দিল্লীতে আছে বলে 'আছার-ই-দিল্লী' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে [সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৩]; হযরত শাহ নাসিরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রাহঃ) [মৃ: ৭৮১ হিজরী]; খাজা আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী (রাহঃ) [মৃ: ৬৯০ হিজরী]; শায়খ শামসুদ্দীন তুর্ক-পানিপথী (রাহঃ) [মৃ: ৭১৮ হিজরী]; খাজা জালালুদ্দীন কবীরুল আওলিয়া (রাহঃ) [মৃ: ৭৬৫ হিজরী]; খাজা আব্দুল হক রাদলবী (রাহঃ) [মৃ: ৮৩৭

হিজরী]; খাজা আ'রিফ (রাহঃ) [মৃ: ৮৮২ হিজরী]; শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রাহঃ) [মৃ: ৯৪৪ হিজরী]; শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী (রাহঃ) [মৃ: ৯৮৯ হিজরী]; শায়খ নিজামুদ্দীন থানেশ্বরী (রাহঃ) [মৃ: ১০২৪ হিজরী]; খাজা মুহিবুল্লাহ ইলাহাবাদী (রাহঃ) [মৃ: ১০৫৮]; শাহ আব্দুল বারী সিদ্দিকী (রাহঃ) [মৃ: ১২২৬ হিজরী]; মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাবী (রাহঃ) [মৃ: ১২৫৯ হিজরী]; হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) [মৃ: ১৩৪৬ হিজরী]; হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী (রাহঃ) [মৃ: ১৩৪২ হিজরী]; কুতবুল আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহঃ) [মৃ: ১৩২৩ হিজরী]; শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রাহঃ) [মৃ: ১৯২০ ঈসায়ী]; এবং শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ) [মৃ: ১৯৫৭ ঈসায়ী]।

চিশ্‌তিয়া তরীকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহপ্রেমের প্রাবল্য। এ কারণেই এই তরীকার উচ্চপর্যায়ের ওলিদের মধ্যে জ্বালাময়ী হালের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মাশাইখদের মধ্যে আগেকার যুগে 'সামা' বা মা'রিফাতের গজল প্রচলিত ছিলো। তবে আজকাল সামা খুব বেশী প্রচলিত নয়- কারণ, সাধারণ মুরীদরা সঠিক পদ্ধতিতে তা শ্রবণ কিংবা পরিবেশন করেন না।

চিশ্‌তিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবা

চিশ্‌তিয়া তরীকার অজিফা ও জিকির-মুরাকাবা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। আর তরীকতের রাস্তায় স্বীয় শায়খ বা মুর্শিদের প্রতিটি নির্দেশ পালন হলো অবশ্যকরণীয়। অন্যথায় মকছুদ পূর্ণ হবার নয়।

প্রথমেই ফাতেহা পাঠ ও সাওয়াব রেসানী (সাওয়াব প্রদান) করতে হয়। এর নিয়ম হলো: ১১ বার ইস্তিগফার, ৩ বার বিসমিল্লাহসহ ফাতিহা পাঠ, এরপর বিছমিল্লাহসহ ৩ বার সূরা ইখলাস, তৎপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাতের মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী করা। সাধারণত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে-আওলাদ এবং সাহাবায়ে কেরাম, দুনিয়ার সকল পীর-আওলিয়ার রূহ, চিশ্‌তিয়া তরীকার সকল আওলিয়ার রূহ এবং খাস করে মা-বাবার (মৃত হলে রূহের উপর) হায়াতে তায়্যিবাহ এবং স্বীয় পীর সাহেবের হায়াতে তায়্যিবার প্রতি সাওয়াব রেসানী করা হয়। তারপর কিবলামুখী হয়ে বসে জিকির শুরু করতে হবে। প্রথমদিকে মুরীদকে ছয় তাসবিহ, তাসবীহে ফাতিমী, দমের জিকির ইত্যাদি সবক দেওয়া হয়ে থাকে।

তারপর এক জরবী, দুই জরবী, ইসমে যাত, তেরো তাসবীহে জিকির করতে হয়। এরপর শুরু হবে মুরাকাবা (ধ্যান)।

সাধারণত লতীফার মুরাকাবা করতে হয়। চিশ্‌তিয়া তরীকা অনুযায়ী মানবদেহে মোট ১০টি লতীফা আছে। এগুলো হলো: ১. কল্‌ব - বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ২. রূহ - ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ৩. সির - বাম স্তনের দু'আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে; ৪. খফী - কপালের মধ্যে সিজদার স্থানে; ৫. আখফা - মাথার তালুর মাঝখানে; ৬. নফ্‌স - নাভীমূলে; ৭. আব; ৮. আতশ; ৯. খাক; এবং ১০. বাদ। শেষোক্ত চারটি দেহের সর্বত্র বিরাজমান।

আগেই বলেছি চিশ্‌তিয়া তরীকায় ১৩ তাসবীহের জিকির চালু আছে। উচ্চ পর্যায়ের এই জিকিরের মাধ্যমে প্রথমে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', এরপর 'ইল্লাল্লাহ্', তারপর 'আল্লাহু-আল্লাহ' এবং সবশেষে 'আল্লাহ' জিকির করা হয়। মোট ১৩ শতবার জিকির করতে হয় বলে একে ১৩ তাসবীহের জিকির বলে।

২. কাদিরিয়া

গাওসুল আযম হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) [মৃ: ৫৬১ হিজরী] হচ্ছেন এই প্রসিদ্ধ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকার জিকির-মুরাকাবা অনেকটা চিশ্‌তিয়া তরীকার মতোই। শায়খ জিলানীর জীবদ্দশায়ই কিছু বিশিষ্ট মুরীদের মাধ্যমে কাদিরিয়া তরীকার প্রসার লাভ করে। মিশর, সিরিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশ ছাড়াও উপমহাদেশসহ প্রাচ্যের সর্বত্র কাদিরিয়া তরীকাপন্থীদের সন্ধান মিলে।

কাদিরিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবা

ফাতেহা পাঠ এবং সাওয়াব রেসানী চিশ্‌তিয়া তরীকার অনুরূপ- তাই এ সম্পর্কে আর অতিরিক্ত কিছু বলার নেই। দশটি লতীফার নাম ও অবস্থানও চিশ্‌তিয়াদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। জিকিরের ক্ষেত্রে জিকিরে এক জরবীর উপর প্রাধান্য বেশী। এই জিকিরের মাধ্যমে 'আল্লা-হু' এর জরব (ধাক্কা) কল্‌বের উপর দিতে হয়। এছাড়া জিকিরে দুই জরবী, তিন ও চার জরবীর সবকও আছে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর জিকিরকে নফী (বিলুপ্ত) এবং ইসবাত (স্থিত) বলে। কাদিরিয়া তরীকায় এই জিকির করার সময় 'লা-ইলাহা' বলার সময় সবকিছু বিলুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত খিয়াল করতে হবে এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় সবকিছু আবার স্থিত হয়েছে ভাবতে হবে। কাদিরিয়া

তরীকায় পাস-আনফাস, জিকরে খফী এবং বিভিন্ন লতীফার মুরাকাবা আছে। মোটকথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিশ্‌তিয়া তরীকার মতো এই তরীকায়ও অনুরূপ জিকির-আজকার ও মুরাকাবার সবক মুরীদদেরকে দেওয়া হয়।

উপমহাদেশে কাদিরিয়া তরীকাপন্থীদের সংখ্যা চিশ্‌তিয়া, নকশবন্দিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়াদের তুলনায় অনেকটা কম।

৩. নকশবন্দিয়া

বর্তমান উজবেকিস্তানের বুখারায় এই প্রসিদ্ধ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দীন আল-বুখারী নকশবন্দীর [মৃ: ৭৯১ হিজরী] জন্ম। নকশবন্দী শব্দের অর্থ চিত্রকর। তবে তিনি কোনদিন ছবি আঁকেন নি। বাস্তবে সাধনার উচ্চ মার্গে পৌঁছে তাঁর হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জগতের চিত্র বা নকশা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। তিনি এক পর্যায়ে যেদিকেই অন্তরদৃষ্টে তাকিয়েছেন সেদিকে হাক্বিকাত তথা আল্লাহর তাজাল্লি অবলোকন করতে থাকেন। নকশবন্দ শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো 'প্রকৃত পূর্ণতার রূপ হৃদয়ে ধারণকারী'।

নকশবন্দিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবা

অন্যান্য তরীকার মতো নকশবন্দিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবার শুরুতে সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে নিয়মিত ওয়াজিফা ও দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম আছে। সাধারণত জিকিরে খফী তথা নীরবে জিকির করার উপরই এই তরীকার শায়খরা মুরীদদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ইসমে যাত তথা 'আল্লাহ, আল্লাহ' জিকির ক্বলবের মধ্যে 'জারি' হওয়ার উদ্দেশ্যে মশক করতে হয়।

নকশবন্দিয়া তরীকা মুতাবিক মানবদেহে মোট ১০টি লতীফা আছে। অন্যান্যগুলোর তুলনায় এসব লতীফার মধ্যে কোন কোনটির স্থান কিছুটা ভিন্ন। যেমন: ১. : এর স্থান বাম স্তনের ২ আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ২. রূহ: এটা ডান স্তনের ২ আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ৩. সির: এর স্থান বাম স্তনের ২ আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে; ৪. খফী: ডান স্তনের ২ আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে অবস্থিত; ৫. আখফা: এটা ও রূহের মধ্যবর্তী স্থানে বুকের কড়ির নীচে অবস্থিত; এবং ৬. নফস: নফসের অবস্থান হলো কপালের সিজদার স্থানে। বাকী চারটি তথা আব, আতশ, বাদ ও খাকের কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নেই, এগুলো দেহের সর্বত্র বিরাজমান।

উল্লেখ্য প্রথম ৫টি লতীফার মূল ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শেষের ৫টি নিম্নজগত তথা আলমে খালকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উক্ত প্রতিটি লতীফার দিকে খিয়াল করে জিকির-মুরাকাবা করতে হয়। এতে সালিকের অন্তরে এসব লতীফার হাক্বিকাত উন্মোচন হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খিয়ালের মাধ্যমে ইসমে জাতের জিকির এককেটি লতীফার মাধ্যমে করতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে ২টি, ৩টি থেকে ১০টি পর্যন্ত লতীফার জিকির-মুরাকাবা একই সাথে করানো হবে। এভাবে একই সঙ্গে ১০টি লতীফার জিকির করাকে বলে 'সুলতানুল আজকার'। এই জিকির হলো নকশবন্দিয়া তরীকার সর্বোচ্চ পর্যয়ের জিকির।

৪. সুহরাওয়ার্দিয়া

হযরত শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি (রাহঃ) [মৃত: ১২৩৪] এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইসলামের মৌলিক আমল-আকীদার প্রতি কঠোরভাবে সম্পৃক্ততা হচ্ছে এই তরীকার বৈশিষ্ট্য। তরীকা প্রতিষ্ঠার সময় ইসলামী বিশ্বে মোঙ্গলদের দৌরাত্ম্য ছিল চরমে। তাই এই তরীকা এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তরীকার শায়েখরা ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার্থে জীবন-মরণ চেষ্টা-সাধনা করেছেন। খুব শীঘ্র এই তরীকা পাক-ভারত-বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানেও এই তরীকাপন্থী সুফি-দরবেশ ও সাধারণ মুসলমান সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।

৫. মুজাদ্দিদিয়া

দ্বিতীয় সহস্রাব্দির মুজাদ্দিদ আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) [৯৭১ - ১০৩৪ হিজরী] এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তরীকাটি মূলত হিজরী অষ্টম শতকে শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরীকার একটি শাখা। আহমদ সিরহিন্দি (রাহঃ) জীবনভর মোগল সম্রাট আকবরের 'দীনে ইলাহী' নামক নতুন ধর্মমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত মুর্শিদে কামীল হযরত বাকী বিল্লাহ (রাহঃ) এর নিকট থেকে তরীকতের দীক্ষা এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হোন।

মুজাদ্দিদিয়া তরীকাপন্থীদের বৈশিষ্ট্য হলো জিকরে খফীর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ। তবে জিকিরের নিয়ম-কানুন অনেকটা নকশবন্দিয়াদের মতোই। ভারতবর্ষে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রাহঃ) জন্ম ও কর্ম স্থায়ী ছিলো বলেই তাঁর

নামানুসারে পরবর্তীতে এই তরীকার বিকাশ ঘটে। বর্তমানে উপমহাদেশের সর্বত্রই এই তরীকার অনুসারীরা বিদ্যমান। আমরা যেহেতু ইতোমধ্যে নকশবন্দিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবার উপর কিছুটা বক্তব্য তুলে ধরেছি, তাই প্রায় একই ধরনের মুজাদ্দিদিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবার উপর তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রোজন বিধায় পাঠকদের নিকট অনুরোধ, তাসাওউফের নিয়মানুযায়ী আপনারা স্ব-স্ব মুর্শিদের নিকট থেকে জিকিরের সবক গ্রহণ করে নেবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলমে মা'রিফাত হাসিলের উপায় ঃ তাসাওউফ চর্চার শুরু

তাসাওউফ চর্চা শুরু হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই। কারণ, তাসাওউফ তো ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অপর নাম। তবে সে যুগে 'তাসাওউফ' নামটি অপরিচিত ছিলো। তাসাওউফ দ্বারা যাকিছু শিক্ষা দেয়া হয়, একজন মা'রিফাত অন্বেষী সালিক যেসব অভ্যাস দ্বারা নিজের নফসের ইসলাহ সাধনে ব্রতী হবেন তা সবগুলোই সেই প্রাথমিক যুগে ছিলো, কিন্তু ছিলো না শুধু 'তাসাওউফ' নামটি। অবশ্য শুধু তাসাওউফের বেলা এ ব্যাপারটি মূখ্য নয়। ইসলামী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার জন্মও নিয়েছে বেশ পরে। যেমন 'ইলমে তাফসীর', 'ইলমে নাহু', 'ইলমে কালাম', 'ইলমে ফিক্‌হ', 'ইলমে তাজবীদ', ও 'ইলমে হাদীস' ইত্যাদি। তবে এসব বিষয়ের উপর অতীতে গবেষণা কিন্তু হয়েছে। যে তাফসীর সকল তাফসীরের ঊর্ধ্বে বলে বিবেচিত সেই তাফসীরের মুফাস্‌সীর ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। কিন্তু তাঁর যুগে 'তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস' নামকরণে কোন কিতাব ছিলো না। তবে তাঁর তাফসীর বা ব্যাখ্যা লিখিত কিতাবে অবশ্যই ছিলো।

তাসাওউফ সম্পর্কে ইতিহাসের জনক নামে খ্যাত ইবনে খালদুন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দীমায় লেখেনঃ এই জ্ঞানটি হচ্ছে পবিত্র আইনের (অর্থাৎ শরীয়তের) একটি শাখা যা উম্মাহর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাথমিকভাবে এটা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে অন্যরা তা শিক্ষা করেন। এর মূলে আছে ইবাদতের প্রতি আত্মনিয়োগ, মহান আল্লাহর দরবারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা, দুনিয়ার চাকচিক্য ও মনভুলানো বিষয়ের প্রতি অনীহা, জাগতিক অনন্দ-ফুর্তি, ধন-সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতি অর্জন থেকে দূরে থাকা- যা অধিকাংশ মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং নির্জনতা অবলম্বন- যাতেকরে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা যায়। এসব বিষয় ছিলো সকল সাহাবায়ে কেরাম ও আগেকার যুগের মুসলমানদের নিত্যদিনের অভ্যাস। কিন্তু ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দির পর থেকে যখন মানুষ বেশী বেশী করে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলো তখন যারা সাহাবায়ে কেরাম ও আগের যুগের মহাত্মনদের অনুসারী ছিলেন তাঁদেরকে মানুষ 'সূফী' বা তাসাওউফপন্থী বলে সম্বোধন করতে লাগলো। [ইবনে খালদুন, মুকাদ্দীমা (মক্কা: দারাল বায, ১৩৯৭ হিজরী / ১৯৭৮, ৪৬৭]

তাসাওউফ শব্দের উৎপত্তি অনেকের মতে 'সুফি' শব্দ থেকেই হয়েছে। অর্থাৎ যে তাসাওউফের উপর মেহনত [বা যিকির-মুরাক্বাবা] করেন তিনিই সূফী। তাসাওউফ ও সূফী শব্দব্যবহার সর্বপ্রথম যে সূফী দ্বারা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন হযরত বায়েজিদ বিস্তামী (রাহঃ)। প্রখ্যাত এই অলিআল্লাহ ১১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। এক রিওয়ায়েত থেকে জানা যায় তিনি একদা বলেছিলেন, 'আমি একজন সুফিকে দেখেছি যিনি কাবা শরীফ তওয়াফরত ছিলেন। আমি তাঁকে একটি দিরহাম হাদীয়া দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি'। সুতরাং তাসাওউফ কি জিনিস তা বুঝতে গেলে তাসাওউফপন্থী বা সুফীয়ায়ে কেরাম কারা তা জেনে নেয়াই হবে যথাযথ।

সুফীয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের পথ বা তরীকার সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হচ্ছে ফাতহুল বারীতে উল্লেখিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি প্রখ্যাত হাদীস। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার অলির বিরুদ্ধাচরণ করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ আমার কাছে আসে যেসব ব্যাপার তার জন্য আমি অবশ্যকরণীয় করে দিয়েছি যা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় তা নিয়ে এবং সে আরও কাছে আসতে থাকে নফল ইবাদত-সহকারে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাকে ভালোবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমিই হয়ে যাই তার কান যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখের জ্যোতি যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত যা দ্বারা সে [বস্তুসমূহ] ধরে এবং তার পা যা দ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট যা চায় আমি অবশ্যই তা তাকে দান করি, এবং সে যখন আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।" [ফাতহুল বারী, ১১.৩৪০-৪১, হাদীস ৬৫০২]

উপর্যুক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ), ইমাম বাইহাকী (রাহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। এটি একটি সহীহ হাদীস। এই হাদীস শরীফে তাসাওউফের অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। আরও ব্যাপক অর্থে সূফী হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি, শরীয়তের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত ও তার উপর পাবন্দ- কারণ, উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, 'আমার বান্দাহ আমার কাছে আসে যেসব ব্যাপার তার জন্য আমি অবশ্যকরণীয় [ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাতে মুআক্কাদা] করে দিয়েছি যা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় তা নিয়ে ...'। সুতরাং শরীয়তের মৌলিক বিষয়সমূহ জানা ও মানা একান্ত জরুরী। হাদীস শরীফে আরোও

বলা হয়েছে, 'এবং সে আরও কাছে আসতে থাকে নফল ইবাদত-সহকারে [নফল নামায-রোযা-যিকির-মুরাকাবা, দান-খয়রাত, সদকায়ে জারিয়া, মেজবানী, খিদমাত ইত্যাদি] যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাকে ভালোবাসি'। আর নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদত হচ্ছে তরীকাতপন্থীদের জন্য প্রায় অবশ্যকরণীয় বিষয়বস্তু। এসব ব্যাপার স্বীয় পীরের নির্দেশে সালিক নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করে থাকেন। ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত ছাড়াও বান্দাহ যখন প্রভুর মা'রিফাত তথা পরিচিতির মাধ্যমে প্রভুর নৈকট্য হাসিলে ব্রত হয় তখন আল্লাহ তার এই বান্দাহকে বিশেষ জ্ঞান দান করেন যা তিনি হাদীস শরীফে বর্ণিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন এভাবে: 'আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমিই হয়ে যাই তার কান যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখের জ্যোতি যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত যা দ্বারা সে [বস্তুসমূহ] ধরে এবং তার পা যা দ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট যা চায় আমি অবশ্যই তা তাকে দান করি, এবং সে যখন আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি'। এককথায়, তাসাওউফের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হয়ে যাওয়া। তাসাওউফপন্থী হওয়া তথা হক্কানী পীরের মুরীদ হয়ে তাসাওউফচর্চা ছাড়া সকল ঈমানদারের অভীষ্ট লক্ষ্য 'আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়া' খুবই কঠিন ব্যাপার। বাস্তবে পীর হচ্ছেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক আর মুরীদ হলেন রোগী। রোগী আমরা সকলেই। আমাদের মধ্যে বিরাজ করে নফসে আম্মারা নামক এক দুশমন ও তাকে সর্বদা ওয়াসওয়াসা দিয়ে যাচ্ছে তার সাথী মরদুদ শয়তান। এই উভয় দুশমনের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যেই হক্কানী পীরের নিকট বাইআত গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশিত তরীকায় ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আজকারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পীর-মুরীদীর গুরুত্ব সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

উপর্যুক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত 'আমি হয়ে যাই তার হাত, পা, চোখ ...' ইত্যাদি কথা রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। আসলে 'তাওহিদ' বা আল্লাহর একত্বের স্তরে উন্নীত সালিকের অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, এ স্তরে পৌঁছে গেলে খোদান্বেষীর চেতনা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। তিনি যা করেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করেন, যা বলেন আল্লাহর নির্দেশেই বলেন। তবে এটা ওহীর পর্যায়ভূক্ত নয়। বাস্তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ এই স্তরটি হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফের এই আয়াতেরই ব্যাখ্যাঃ "তিনিই তোমাদেরকে ও তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন।" [কুরআন ৩৭ ঃ ৯৬]

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 'তাসাওউফের উৎপত্তি কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকেই হয়েছে।' খাইরুল কুরুন বা প্রাথমিক সর্বোত্তম তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলমানদের জিন্দেগী অনেকটা দুনিয়াদারিত্বের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সর্বযুগেই আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিদ্যমান আছেন। সে যুগে এদের সংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তথাপি মুসলিম সমাজের অবস্থা দেখে একাধিক সূফী-দরবেশ 'তাসাওউফ' নামকরণে 'তাজকিয়ায়ে নফসের' রাস্তাকে চিরতরে খোলা রাখার ব্যবস্থা করার প্রয়াস পান। তাঁদের পরিশ্রম ও দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা এবং সর্বোপরি ইলহামী নির্দেশে গড়ে উঠেছে অনেক তরীকা বা তাজকিয়ায়ে নফসের রাস্তা। [ইলহাম, কাশফ, ইলমে লাদুনী ইত্যাদির উপর এ গ্রন্থের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।] এ সবই 'তাসাওউফ' নামক ইলমী ও আমলী চর্চার অন্তর্ভূক্ত। এবার প্রশ্ন জাগে তাসাওউফ বা নফসকে শুদ্ধিকরণের উৎস যদি কুরআন ও হাদীস শরীফের অন্তর্ভূক্ত হয়েই থাকে- ইসলাম ধর্মের মধ্যে তাসাওউফের গুরুত্ব কতটুকু? এর জবাব হয়তো আমরা খুঁজে পাবো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে।

(হাদীসের ভাবার্থ) "হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বসা ছিলাম যখন, ধবধবে শ্বেত পোশাক পরিহিত ও কালো চুলবিশিষ্ট একব্যক্তির আগমন ঘটলো। তিনি যে খুব বেশীদূর ভ্রমণ করে আসেন নি তা সহজেই বুঝা যাচ্ছিল। আমাদের কেউই তাকে চিনতে পারি নি। আগন্তুক নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একেবারে কাছে এসে বসে পড়লেন, তাঁর হাঁটু মুবারকের সঙ্গে আগন্তুকের হাঁটুদ্বয় লেগে গেল। এরপর হাঁটুর উপর হাত রেখে প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'ইসলাম হচ্ছে একথা বলে সাক্ষ্য প্রদান যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল], এবং নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমজান শরীফে রোযা রাখা ও সামর্থ থাকলে বাইতুল্লায় হজ্জ পালন করা।'

আগন্তুক বললেন, 'আপনি সত্য কথা বলেছেন।' আমরা একথা শোনে অবাক হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করার পর তার জবাব নিজেই আবার অনুমোদন করছেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তা হলো আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহ, তাঁর নবী-রাসূলগণ, শেষবিচার দিবস এবং তাকদীরের (ভালো ও মন্দের)

প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।' আগন্তুক আবার বললেন, 'আপনি সত্য কথা বলেছেন'। এবার তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এখন আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন?' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'এটা হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা হবে যেনো আপনি আল্লাহকে দেখছেন, আর যদিও বা আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করা যে) তিনি তো আপনাকে দেখছেন'।"

বর্ণনাকারী হযরত উমর (রাঃ) আরও বলেন, "এরপর আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি অনেক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উমর, তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন?' আমি জবাব দিলাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'তিনি ছিলেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন'।" [মুসলিম শরীফ, ১.৩৭, হাদীস ৮]

উক্ত সহীহ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম নববী (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসের উপরই দ্বীন-ইসলাম ভিত্তিশীল। হাদীসে দ্বীন শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: "আতাকুম ইউ'আল্লিমুকুম দ্বীনাকুম।" যার অর্থ হলো, 'তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে'।

পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" [হিজর: ৯]

সুতরাং তাসাওউফ বলতে যা বুঝায় তা উক্ত হাদীস শরীফের শেষের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'ইহসান'-সহ প্রভুর ইবাদত ও যাবতীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়া। আল্লাহ পাক অবশ্যই তাঁর কালামে পাকে ইরশাদকৃত 'সংরক্ষণের' প্রতিশ্রুতি কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করবেন। উলামায়ে কেরাম উক্ত আয়াতে করীমের ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র কুরআন শরীফকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারটি বলেই ক্ষান্ত হন নি। বরং একই সাথে পুরো দ্বীন-ইসলাম সংরক্ষণের কথা উক্ত আয়াতে ইশারা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। কিভাবে দ্বীন সংরক্ষিত হচ্ছে তা একটু ভেবে দেখা যাক।

উক্ত 'হাদীসে জিব্রাঈল' থেকে এটা স্পষ্ট যে, দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি মৌলিক তিনটি বিষয়ের উপর। তাহলো ক. ইসলাম, খ. ঈমান ও গ. ইহসান। ইসলামের মৌলিক ভিত তৈরী করে গিয়েছেন আগের যুগের ইমামগণ। অর্থাৎ চার মাজহাবের চার ইমাম। আর

এই শরীয়ত সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া তথা প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কেরাম। এছাড়া কিছু বিশিষ্ট ইমামগণ 'আক্বীদা' সম্পর্কিত গবেষণা করে তা সকল যুগের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। যেমন ইমাম তাহাবী (রাহঃ), যাঁর কিতাব 'আক্বীদাতুত-তাহাবী' আজো মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং 'আক্বীদা' যেহেতু ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই এটা সংরক্ষণের দায়িত্ব উলামায়ে কেরামই বহন করে যাচ্ছেন। কিয়ামত পর্যন্ত করবেনও। বাকী থাকলো 'ইহসান'। ইহসানের সংজ্ঞা উক্ত হাদীস শরীফে, 'আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এভাবে করো যেমন তুমি তাঁকে দেখছো' বলা হয়েছে। কিন্তু এই দেখার মতো অভ্যন্তরীণ অবস্থায় উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন তাজকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মার পরিশুদ্ধকরণ। আর এই কাজটি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাসাওউফের ইমামগণ। যাদেরকে আমরা আধ্যাত্মিক চিকিৎসক বা হক্কানী পীর বলে সম্বোধন করে থাকি। সুতরাং দ্বীন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে 'ইহসানের' স্তর সমুন্নত করার প্রয়োজনীয়তা হেতু ইতিহাসব্যাপী একদল অলিআল্লাহ বিধিবদ্ধ উপায়ে নফসের তাযকিয়াকরণে গড়ে তুলেছেন কিছু তরীকা বা রাস্তা- যাকে ইসলামী পরিভাষায় ইলমে তাসাওউফ বলে। এই তাসাওউফ তাহলে ইসলামী শরীয়তের একটি অংশ। পুরো দ্বীন সংরক্ষণের জন্যই ইসলামী শরীয়ত (মাসআলা-মাসাইল ইত্যাদি) সুস্পষ্টভাবে ইমামগণ কিতাববন্দী ও তা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য রেখে গেছেন। এই দ্বীনেরই একটি অংশ 'ইহসান'-এর গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে কিতাববন্দী ও মুসলমানদের আমলী জিন্দেগীতে ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার উপায়-উপকরণ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সুতরাং তাসাওউফ শুধু শরীয়তের অংশ নয় বরং এর আত্মা। কারণ, ইহসান ছাড়া ইবাদতের মূল্য অনেক কম। উক্ত হাদীসে জিব্রাঈল থেকে একথা স্পষ্ট।

আগের যুগের প্রায় সবাই ও বর্তমান যুগের [কিছু অদূরদর্শী 'আলিম' নামধারী ছাড়া] সকল উলামায়ে কেরাম 'তাসাওউফপন্থী' ছিলেন। এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এবং দেখবোও। আমরা এখন নিশ্চিতভাবে জানি যে, মাযহাবের চারজন ইমামই তাসাওউফপন্থী ছিলেন। প্রত্যেকেরই একেকজন হক্কানী পীর ছিলেন যাঁদের কাছ থেকে ইমামগণ খিলাফত লাভ করেন। তাসাওউফের গুরুত্ব কতটুকু তা এ তথ্য থেকেই যথেষ্ট বলে মনে করি। আর যারা তাসাওউফকে নিয়ে বাজে প্রশ্ন করে, তাদের উচিত আগের যুগের সালাফদের জীবনী অধ্যয়ন করা। হয়তো এতে তাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটবে ও হক্কানী কোন পীরের নিকট মুরীদ হয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করবেন।

ইসলামে তাসাওউফের স্থান

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা এটাই প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, তাসাওউফ ইসলামী শরীয়তেরই একটি অংশ। এর স্থান শরীয়তের ভেতরে- বাইরে নয়। কারণ তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের 'ইহসান'-এর গুণাবলী পয়দা করা। আর ইহসান অর্জন হচ্ছে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক- যা ছাড়া ইবাদতের কোন মূল্য নাই। এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াত ও একটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। এগুলো প্রমাণ করবে যে, ইহসান বা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া যে কোন ইবাদতই হোক না কেন তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

নফসের তাজকিয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ "তিনিই তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল বানিয়েছেন যিনি, তোমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান ও তোমাদের (নফসকে) পবিত্রকরণ করেন এবং শিক্ষা দেন কুরআন ও জ্ঞান যদিও তোমরা ইতোমধ্যে অবশ্যই পথভ্রষ্ট ছিলে।" [জুমু'আ: ২-৩]

এই আয়াতে করীমের মধ্যে শুদ্ধিকরণ শব্দটি আছে যা আরবীতে 'ওয়া ইউযাক্কিহিম' বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে সর্বপ্রকার শিরক থেকে মুক্ত করে তাদের হৃদয়কে 'ইহসানের' স্তরে উন্নীত করা। ইবনে কাছির (রাহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে যেয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছেন। 'তাজকিয়া' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "এর অর্থ হলো পবিত্রকরণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির হৃদয়কে জাগতিক বন্ধন (বা বস্তুতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ) থেকে মুক্ত করে পবিত্রাবস্থায় উপনিত করা।"

মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, রোজ কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে তিনি হবেন জিহাদে নিহত একজন শহীদ। তাঁকে সম্মুখে হাজির করার পর আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাকে আমি যে জীবন দান করেছিলাম তা দিয়ে তুমি কি করেছ?' তিনি জবাব দিবেন, 'আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য যুদ্ধে কুরবান করেছি।' কিন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দেবেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি নিজেকে একজন বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যুদ্ধ করেছিলে, আর এটা তুমি

অর্জন করে ফেলেছ।" এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর বিচার করা হবে সেই ব্যক্তির যিনি পৃথিবীতে দ্বীনের আলিম ছিলেন এবং অন্যকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলেন, এছাড়া তিনি ক্বারীও ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে এসব জ্ঞানের অধিকারী করার কথা জানিয়ে দেবেন। এতে তিনি আনন্দিত হবেন। এরপর প্রভু প্রশ্ন করবেন, 'আমার এসব অনুগ্রহকে তুমি কিভাবে খরচ করেছো?' তিনি জবাব দিবেন, 'আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনেই পবিত্র জ্ঞান (শরীয়ত) শিক্ষা করেছি, শিক্ষার্থীদের প্রতি তা ছড়িয়ে দিয়েছি ও কুরআন তিলাওয়াত করেছি।' আল্লাহ পাক তখন কঠোর ভাষায় বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো! তুমি দ্বীন শিক্ষা করেছো এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তোমাকে আলিম বলবে, এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছো যাতে মানুষ তোমাকে ক্বারী বলে। এসব প্রতিদান তুমি পেয়ে গেছ।" এরপর আল্লাহর নির্দেশে তাঁকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে ধনী এক ব্যক্তিকে। আল্লাহ পাক তাঁকে যেসব অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন তা জানিয়ে দেবেন। এতে লোকটি আনন্দিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। এরপর মহান আল্লাহ পাক তাঁকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি আমার দেয়া এসব নিয়ামত কিভাবে খরচ করলে?' লোকটি জবাব দেবেন, 'হে আল্লাহ! আমি প্রতিটি দানই একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি কামনায় খরচ করেছি।' একথা শোনে আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি তা দান করেছো এই আশায় যে লোকে তোমাকে দানবীর বলবে, এ আশা তোমার ইতোমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে।' এরপর তাঁকেও জাহান্নামের আগুনে ফেলে দিতে নির্দেশ করা হবে। [সহীহ মুসলিম শরীফ, ৩. ১৫১৪: হাদীস ১৯০৫]

উপর্যুক্ত হাদীসটির উপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যার তেমন বেশী প্রায়োজন নেই। এতে 'ইহসান' অর্জনের গুরুত্ব পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আঞ্জাম দিতে হবে। আর এ উপায়ে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে পারলে আমাদের প্রতিটি উত্তম কাজই ইবাদতের মধ্যে গন্য হবে। কিন্তু ইহসানের মাক্বাম বা স্তরে উন্নীত হওয়া এমনিতেই সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন তাসাওউফ তথা তাজকিয়ায়ে নফ্স। সুতরাং বলতেই হয় ইসলামে তাসাওউফের স্থান সর্বোচ্চে। তবে তা অর্জনে পীর-মুরীদীর প্রয়োজন কতটুকু? এ প্রশ্নের জবাব আমরা পরে দেবো। এখানে এটুকু বলে রাখি, একা একা অচিন একটি বিপদসংকুল রাস্তায় ভ্রমণ কোন বুদ্ধিমানের কাজ

হতে পারে না। আমাদের নফস তো দুশমনই- তার উপর সর্বদাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে মানুষরূপী, দুষ্ট জ্বিনরূপী ও অন্তরে কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানদের অভাব নেই। অবশ্য আসল শয়তান এবং তার চেলারা তো আছেই। রাস্তা সম্পর্কে পুরো ওয়াকিফহাল একজন হক্কানী পীরের নির্দেশ মুতাবিক এপথে পাড়ি জমানো অনেকটা নিরাপদ- এ সরল কথাটি কি আর বেশী বুঝানোর প্রয়োজন আছে? এরপরও কেউ যদি মনে করেন একা একাই চলতে পারবেন- তা-তে আমাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু আমরা কখনও তা 'পরামর্শ' উপদেশ করবো না। বরং আমাদের পরামর্শ হলো, তাজকিয়ায়ে নফসের একমাত্র সঠিক রাস্তা হচ্ছে হক্কানী পীরের শরণাপন্ন হওয়া- অন্যথায় বিপদ আছে!

আসলে ইসলাম ছাড়া তাসাওউফ যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি তাসাওউফ ছাড়া ইসলামও অসম্পূর্ণ। কারণ হলো, যে শরীয়তকে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয সেই শরীয়ত শুধু সাধারণভাবে কুরআন-হাদীসের কথা মানাকেই বুঝাচ্ছে না- প্রত্যেকের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা দুরস্ত করেই তা মানতে হবে। যেমন: 'তাক্বওয়াহ' [খোদাভীরুতা], 'ইখলাস' [আন্তরিকতা], 'তাওয়াক্কুল' [আল্লাহর উপর ভরসা] ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

ইলমে তাসাওউফের উপর আগের যুগের প্রসিদ্ধ অলি-আল্লাহদের বক্তব্য

প্রভুপরিচিতি বা মা'রিফাত হাসিল সকল যুগে সকল মুসলমানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিলো এবং থাকবেও। কারণ, আল্লাহর পরিচিতি অর্জনের মধ্যেই নিহিত ঈমানের পরিপক্কতা। প্রভুকে যে যতো বেশী চিনতে সক্ষম হয়েছে তার ঈমান ততো বেশী পাকা হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, একজন অন্ধের মুখে 'ঐ দেখো হাতী যায়' বলা আর চোখবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে একই কথা বলা সমান হতে পারে না। যে জিনিসকে আমরা যতো বেশী জানবো-চিনবো সে জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা ততো বেশী নিশ্চিত হবো। ইলমে মা'রিফাত হচ্ছে আল্লাহকে জানা। আর জানার মধ্যেই নিহিত ঈমানী নূরের প্রভাব ও প্রাবল্য। মানুষ যদি কোন বস্তুকে সম্যকভাবে জেনে নেয় তাহলে এটার অস্তিত্ব (অর্থাৎ এটা আছে বলে বিশ্বাস) নিয়ে আর প্রশ্নই করে না। কারণ, এরূপ করা হবে অর্থহীন।

ইসলামের আবির্ভাব-কালে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নূরানী চেহারা মুবারকের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সাহাবায়ে কেরাম ইলমে মা'রিফাতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছিলেন। কারণ, নুবুওয়াতের সেই জ্যোতি তো ছিলো এমন প্রভাবশীল যার তুলনা অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। এ কারণেই জাহিলিয়াতের যুগে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট মানুষ ইসলামের সুধা পানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মধ্যে মা'রিফাতের গভীরত্ব এতো বেশী ছিলো যে এর সরাসরি প্রভাব পরবর্তী দু'টি যুগব্যাপী বিস্তৃত হয়ে যায়। যার কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার যুগ, এর পরবর্তী যুগ ও এর পরবর্তীটি হচ্ছে সর্বোত্তম যুগ।' অর্থাৎ খাইরুল কুরুন। সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) যাঁরা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁদেরকে বলা হয় তা'বিঈ। এদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) ও ইমাম মালিক (রাহঃ) অন্তর্ভূক্ত। আর তা'বিঈনদের যাঁরা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁদেরকে বলে তাবি-তা'বিঈন। অনেক বড় বড় ওলিআল্লাহ সে যুগে জীবিত ছিলেন। আমরা পরবর্তীতে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে সর্বপ্রথম ইমাম পর্যায়ের বড় বড়

ওলিআল্লাহরা ইলমে তাসাওউফের উপর যেসব মন্তব্য করেছেন তার উপর উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। আমরা হিজরী সন মুতাবিক ক্রমানুসারে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করছি।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) [৮৫ - ১৫০ হিজরী]

দুররুল মুখতার গ্রন্থে ইবনে আবিদীন লিখেন: ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন, যদি সেই দু'বছর না হতো, তাহলে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। ইবনে আবিদীন মন্তব্য করেন: দু'বছরের জন্য তিনি (ইমাম আবু হানীফা) সাইয়্যিদীনা ইমাম জাফর সাদিক্ব (রাঃ)-এর সঙ্গলাভ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। আর তিনি এ কারণেই তরীকতের শায়খ (বা মুর্শিদ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) যিনি ছিলেন ইমাম কুশাইরী (রাহঃ)-এর তরীকতের শায়খ, খিলাফত লাভ করেন আবুল কাসিম নাসিরাবাদী (রাহঃ) এর কাছ থেকে, তিনি হযরত সিররী সাক্বতি (রাহঃ) থেকে, তিনি হযরত মারুফ কারখী (রাহঃ) থেকে, তিনি হযরত দাউদ তায়ী (রাহঃ) থেকে এবং তিনি ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রাহঃ)-এর কাছ থেকে তরীকতের খিলাফত লাভ করেন [ইবনে আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩]।

ইমাম মালিক (রাহঃ) [৯৫ - ১৭৯ হিঃ]

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, মদীনা মুনুওয়ারার প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত মালিক (রাহঃ) নবীপ্রেমের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। তিনি পবিত্র মদীনা শরীফ থেকে বের হতেন না এই ভয়ে যে, হয়তো তাঁর মৃত্যু অন্যত্র হয়ে যাবে এবং মদীনা নগরীতে তাঁকে দাফন করা হবে না। আল্লাহ পাক তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। মাজার শরীফের নিকটে জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইমাম মালিক (রাহঃ) এতোই পরহেজগার ছিলেন যে, অযু ছাড়া কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। ইবনে যাওজী তাঁর সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে ষষ্ঠ স্তরের মদীনাবাসী শিরোনামে একটি লেখায় বলেন: আবু মুসআব বলেন, আমি মালিক ইবনে আনাসকে দেখতে যাই। তিনি আমাকে বললেন: আমার জায়নামাযের নীচে দেখো তো কি আছে? আমি জায়নামাযের নীচে কিছু লেখা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: এটা পড়ো। [আমি দেখলাম] এতে একটি স্বপ্নের কথা লিপিবদ্ধ আছে। স্বপ্নটি তাঁর এক ভাই দেখেছেন এবং এতে তিনি নিজে জড়িত। এরপর তিনি নিজেই তা পাঠ করতে লাগলেন: আমি ঘুমের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি। তিনি তখন তাঁর

মসজিদে ছিলেন এবং তাঁর চতুর্দিকে অনেক লোক বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন: আমি আমার মিম্বরের নীচে তোমাদের জন্য উত্তম জিনিস বা জ্ঞান লুকিয়ে রেখেছি এবং আমি মালিককে নির্দেশ দিয়েছি তা মানুষের প্রতি বিলিয়ে দেয়ার জন্য। এরপর মালিক (রাহঃ) কাঁদতে লাগলেন, সুতরাং আমি সেখান থেকে বিদায় হলাম। [ইবনে যাওজী, সিফাতুস সাফওয়া, ১(২), পৃঃ ১২০]

ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রাহঃ) ও হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) যেভাবে উচ্চতর সোপানে আরোহণের জন্য সুফিদের রাস্তায় চলার কথা বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে ইমাম মালিকও (রাহঃ) নিম্নোক্ত বক্তব্যে একই কথা বলেছেন:

যে কেউ শরীয়তের জ্ঞান ও অনুসরণ ছাড়া তাসাওউফের সাধনা করে, সে তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অপরদিকে যে কেউ শরীয়তের জ্ঞানকে আয়ত্ত করেছে কিন্তু তাসাওউফের সাধনা করেনি সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যে কেউ এই দু'টিকে একত্রিত করেছে সেই হক্বপন্থী।

এই মন্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মুহাদ্দিস আহমদ জাররুক (রাহঃ) [মৃঃ ৮৯৯ হিঃ], হাফিজ আলী ক্বারী হারাওয়ী (রাহঃ) [মৃঃ ১০১৪ হিঃ], মুহাদ্দিস আলী ইবনে আহমদ আদাওয়ী (রাহঃ) [মৃঃ ১১৯০ হিঃ] এবং ইবনে আযিবা (রাহঃ) [মৃঃ ১২২৪ হিঃ] এবং অন্যান্যরা। [আলী ক্বারী, শারহু আইনিল ইলম ওয়া জাইনিল হিলম (কায়রো: মাক্বতাবাতুত ছাক্বাফাতিদ্বীনিয়্যা, ১৯৮৯) ১, পৃঃ ৩৩; আহমদ জাররুক, ক্বাওয়াইদুত তাসাওউফ (কায়রো: ১৩১০); আলী আদাওয়ী, হাশিয়াতুল আদাওয়ী আলা শারহি আবিল-হাসান লি রিসালাতি ইবনে আবি জায়িদ আল-মুসাম্মাত কিফায়াতুত তালিবির রাব্বানি লি রিসালাতি ইবনে আবি জায়িদ আল-কাইরাওয়ানি ফি মাযহাবি মালিক, ২, পৃঃ ১৫; ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম ফি শারহিল হিকাম (কায়রো: হালাবি, ১৩৯২/১৯৭২) পৃঃ ৬৫]

ইবনে আযিবা (রাহঃ) বলেন: শায়খ আহমদ জাররুক বলেন: তাসাওউফের দুই হাজারেরও বেশী সংজ্ঞা আছে। সবগুলোর মূলে কিন্তু একই জিনিষ- আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে সত্যবাদিতা। প্রত্যেকটি সংজ্ঞা ব্যক্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্তরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে বলবে: তাসাওউফ এই, তাসাওউফ সেই।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যেসব সুফির কথা [আবু নুয়াঈমের হুলায়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে] বলা হয়েছে, যারা সিদক্বে তাওয়াজ্জুহর [বিশ্বস্ত -আবেদনকারী] অধিকারী ছিলেন, তারা সকলেই তাসাওউফের কোনো কোনো অংশের অধিকারী ছিলেন এবং তা তারা নিজেদের আমলে পরিণত করে গিয়েছেন। এটা নিয়ম যে, সিদক্বে তাওয়াজ্জুহ দ্বীনের একটি অবশ্যকরণীয় বস্তু। কারণ এটার মধ্যে জড়িত ব্যক্তির বিশ্বস্ত তা ও কর্ম (আমাল) যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। মানুষের কর্মপন্থা [আমালী জীবন] এবং এর মধ্যকার আমাল কখনও হক্ব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সিদক্বে তাওয়াজ্জুহ হক্ব হবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি অ-শোকরগুজারদের [আমাল] গ্রহণ করেন না, কিন্তু যদি তুমি শোকরগুজার হও তাহলে তিনি তা তোমার মধ্যে গ্রহণ করবেন [৩৯ঃ৭]।

সুতরাং ইসলামের গুরুত্ব আমলে, এবং আত্মশুদ্ধি (তাসাওউফ) ফিকহের জ্ঞান ছাড়া তা হয় না, কারণ আল্লাহর নির্দেশিত বাহ্যিক আইন-কানুন শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া জানা যায় না; এবং আত্মশুদ্ধি ছাড়া ঐ জ্ঞানকে (শরীয়তকে) আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ শরীয়তের জন্য আত্মশুদ্ধি আর আত্মশুদ্ধির জন্য শরীয়ত উভয়ই জরুরী। যেমন, দেহ ও আত্মা একে অন্যের স্থিতির জন্য জরুরী- একটা থাকলে আর অপরটি না থাকলে অপূর্ণ থেকে যাবে। ইমাম মালিক (রাহঃ)-এর বক্তব্য, যে শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া তাসাওউফের সাধনা করে কথাটির অর্থ এটাই। [ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম, পৃঃ৫-৬]

ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) [১৫০ - ২০৫ হিঃ]

হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাহঃ) তাঁর তাঈদুল হাক্বিক্বিল আউলিয়া গ্রন্থে বলেন: ইমাম শাফিঈ বলেছেন, আমি সুফিদের সুহবতে থেকে তাঁদের নিকট ৩টি বাক্য শিখেছি: সময় একটি অসি, তুমি যদি তাকে কাটতে না পারো তবে তা তোমাকে কেটে দেবে; তুমি যদি তোমার নফসকে সত্যের মধ্যে নিমগ্ন না রাখো তবে তা তোমাকে বাতিলের মধ্যে ব্যস্ত রাখবে; বঞ্চনা হচ্ছে নিরাপত্তা। [সুয়ুতী, তাঈদুল হাক্বিক্বিল আউলিয়া, পৃঃ ১৫]

মুহাদ্দিস আযলুনী তাঁর কাশফুল খাফা ওয়া মুজিলুল আলবাস গ্রন্থে বলেন, ইমাম শাফিঈ বলেছেন, এই পৃথিবীতে তিনটি সুন্দর জিনিস আমাকে দান করা হয়েছে: কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকা, মানুষের সঙ্গে দয়ালু ব্যবহার ও তাসাওউফের রাস্তা অনুসরণ। [আল-আযলুনী, কাশফুল খাফা ওয়া মুজিলুল আলবাস, ১, পৃঃ ৩৪১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) [১৬৪ - ২৪১ হিজরী]

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এই মহান সাধক সুফিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "হে আমার পুত্র! সুফিদের সঙ্গে তুমি অবশ্যই উঠাবসা করবে, কারণ তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞানের ফোয়ারা এবং আল্লাহর স্মরণ তাঁদের হৃদয়ে স্থায়ী আছে। এরাই হচ্ছেন মহান তাপস এবং তাঁদের আয়ত্তে আছে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা।" [তানবীরুল কুলুব, পৃঃ ৪০৫]

তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দীদারে ইলাহী কিভাবে সম্ভব? তিনি জবাব দিলেন, "পাক কুরআন শরীফ [তিলাওয়াত] এর মাধ্যমে।" [তাযকিরাতুল আওলিয়া, মাওলানা নূরুর রহমান]

ইখলাস কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিন বলেন, "কাজ-কর্মের আপদ-বিপদ, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করাই হলো ইখলাস।" [প্রাগুক্ত]

তিনি বলেছেন, প্রয়োজনের মাত্রা অনুপাতে দুনিয়ার সম্পদ সন্ধান করা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার সামিল নয়। [সুফিয়ায়ে কেরামের বাণী]।

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) [মৃঃ ১১০ হিজরী]

তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও সুফি। হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) সারা জীবন সুফিদের পরিধান মোটা সূতার খিরকা পরেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক মুক্তপ্রাপ্তা এক মহিলার সন্তান ছিলেন হযরত হাসান বসরী (রাহঃ)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালকপুত্র হযরত জায়িদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বাবা। তখনকার যুগে হযরত বসরী (রাহঃ)-এর মতো সুন্নাতের এতো কঠোর পাবন্দ অপর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ আছে। বসরা শহরের

বাসিন্দা এই অলিআল্লাহ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর সুনাম ছিলো বিরাট।

ইবনে যাওজী হযরত হাসান বসরীর (রাহঃ) জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, আদাবুশ শায়েখ আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরী। ১০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের সিফাতুস সাফওয়ায় হাসান নামক পরিচ্ছেদে তিনি বসরী (রাহঃ)-এর জুব্বা সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে হযরত বসরী (রাহঃ) তাঁর সাদা জুব্বাটি রেখে যান। এটা তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ পরিধান করেছিলেন। শীত এবং গ্রীষ্মকাল- কোনো সময়ই এটা গা থেকে খুলতেন না। কিন্তু মৃত্যুর পরে দেখা গেলো এই জুব্বাটি অত্যন্ত সুন্দর, স্বচ্ছল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে [ইবনে যাওজী, সিফাতুস সাফওয়া, ২(৪), পৃঃ ১০]

ইবনে ক্বাইয়ূম (রাহঃ) তাঁর রাওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুস্তাক্বীম গ্রন্থে বলেনঃ একদা একদল মহিলা ঈদের দিন বাইরে যেয়ে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলো। তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমরা যাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ব্যক্তি হিসেবে দেখলে তিনি কে? তারা [অনেকে] জবাব দিলো, তিনি একজন শায়খ যার মাথায় ছিলো কালো পাগড়ী। তারা হযরত হাসান বসরীর কথা বলছিলো [ইবনে ক্বাইয়ূম, রাওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুস্তাক্বীম, পৃঃ ২২৫]।

শায়খুল হাদীস আবু নুয়াঈম ইসফাহানী [মৃঃ ৪৩০ হিজরী] তাঁর প্রণীত সুফিদের জীবনীগ্রন্থ হুলইয়াতুল আউলিয়া-তে বলেন, হাসান বসরীর একজন শিষ্য আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ [মৃঃ ১৭৭ হিজরী] সর্বপ্রথম সুফি খানকাহ্ তৈরী করেন। এছাড়া তিনি একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলো আবাদান নামক স্থানে ছিলো [বর্তমান যুগের ইরান-ইরাক সীমান্তবর্তী এলাকায়] [আবু নুয়াঈম ইসফাহানী, হুলইয়াতুল আউলিয়া, (খঃ ৬), পৃঃ ১৫৫]।

সুফিদের সমালোচক হিসাবে খ্যাত ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) স্বীকার করেছেন যে, তাসাওউফের মূল ভিত্তি বসরা শহরেই স্থাপিত [ইবনে তাইমিয়্যা, আত-তাসাওউফীন মাযমুআল ফাতওয়াহুল কুবরা, (খঃ ১১), পৃঃ ১৬]। এ মন্তব্যের একমাত্র কারণ ছিলো হাসান বসরী (রাহঃ) ও তাঁর শিষ্যদের তাসাওউফ চর্চা যা বসরায় শুরু হয়। অবশ্য ইবনে তাইমিয়্যার এই স্বীকারোক্তির মধ্যে একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় লুকিয়ে আছে। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) তাসাওউফ-কে আবিষ্কার

করেছেন। কিন্তু এরূপ ধারণার কোন অবকাশ নেই। কারণ, উক্ত মন্তব্য থেকে এটাই বুঝতে হবে যে, তখনকার দিনে তাসাওউফের চর্চা ব্যাপকভাবে বসরায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাসাওউফ মূলত কুরআন-সুন্নাহর উপর ভিত্তিশীল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায়ও তাসাওউফের চর্চা ছিলো কিন্তু তাসাওউফ নামটি ছিলো না। সে যুগে দ্বীনের বাহক ও আত্মার পরিশুদ্ধকারী হিসেবে সাহাবা উপাধি থেকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন উপাধি ছিলো না, তখন তাসাওউফপন্থী বা সুফি উপাধির কোন প্রয়োজনও ছিলো না। এ ব্যাপারে ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী (রাহঃ)-এর ব্যাপারে লেখায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গায্যালী (রাহঃ) তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের জিহাদুন-নাফস শিরোনামের লেখায় হাসান বসরীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হাসান বসরী (রাহঃ) কি বলেছেন তা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেনঃ আত্মার মধ্যে দুটি চিন্তা ক্রিয়াশীল আছে- এর একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আর অপরটি আসে দুশমনের কাছ থেকে। কোন বান্দাহ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত চিন্তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তখন আল্লাহ তার প্রতি দয়ার্দ্র হন। সে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত চিন্তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেয় আর একই সময় দুশমনের পক্ষ থেকে আগত চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হৃদয়ের এই দ্বৈত আকর্ষণের শক্তি সম্পর্কে উপমা দিতে গিয়ে একটি হাদীস উপস্থাপন করা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদারের হৃদয় করুণাময়ের দু'টি [কুদরতী] আঙ্গুলের মধ্যে বিদ্যমান [মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]।

ইমাম গায্যালী (রাহঃ) হাসান বসরী [রাহঃ] এর অপূর্ব তাক্বওয়াহর কথা ব্যক্ত করে আরও বলেনঃ ভয় ও আশা হচ্ছে আদম সন্তানের প্রতি দুটি বিরাট অবদান; এগুলো ছাড়া কোন মুসলমান জমিনে বিচরণ করতে পারতো না [ডব্লিউ, জে উইন্টার কর্তৃক অনূদিত ইমাম গায্যালীর দ্যা রিমেমবারেন্স অফ ডেথ, পৃঃ ১৮]।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) [মৃঃ ১৬১ হিঃ]

ইবনে কাইয়ুম যাওজিয়্যা (রাহঃ) তাঁর মাদারিযুস সালিকীন এবং ইবনে যাওজী (রাহঃ) তাঁর সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থের আবু হাসিম আল-জাহিদ শিরোনাম পরিচ্ছেদে আবু নুয়াঈমের (রাহঃ) হুলইয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) বলেন: আবু হাসিম আস-সুফী [মৃঃ ১১৫ হিঃ] না হলে আমি নিজের মধ্যে মুনাফিকীর স্বরূপ একটুও বুঝতে পারতাম না। তিনি ছিলেন সুফি শাস্ত্রের

উপর জ্ঞানবানদের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তি। [ইবনে কাইয়ুম যাওজিয়্যা, মাদারিযুস সালিকীন; ইবনে যাওজী, সিফাতুস সাফওয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ১৪০৩/১৯৮৯), ১,২, পৃঃ ২০৩; আবু নুয়াঈম, হুলইয়াতুল আউলিয়া, এসভি আবু হাসিম আস-সুফী]

ইবনে যাওজী আরও বলেছেনঃ আবু হামিদ জাহিদ বলেছেনঃ আল্লাহ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের [সালিকদের] কাছ থেকে দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, যাতেকরে তাঁরা শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং পৃথিবীর সঙ্গে না থাকেন। তিনি এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যারা তাঁকে মান্য করে তাঁর নৈকট্য চায় তারা যেনো জগতকে ভুলে যায়। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানবানরা [আহলুল মা'আরিফ বিল্লাহ] এ জগতে অপরিচিতজন এবং আখিরাতের জন্য বিরহে বিভোর। [ইবেন যাওজী, পূর্বোক্ত]

হারিস আল-মুহাসিবী [মৃঃ ২৪৩ হিজরী]

সুফিতত্ত্বের উপর হারিস ইবনে আসাদ আল-মুহাসিবী (রাহঃ) ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন লেখক। প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত জুনায়িদ বাগদাদী (রাহঃ) তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (রাহঃ), হযরত তাজউদ্দীন সুবকী (রাহঃ) এবং জামালুদ্দিন ইসনাভী (রাহঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে যারা মুতাকাল্লিম [ধর্মজ্ঞানী], ফকীহ [আইনজ্ঞ] এবং সুফি হযরত হারিস ইবনে আসাদ আল-মুহাসিবীর কালাম, ফিকহ ও হাদীস গ্রন্থগুলোর উপর ঋণী [আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবুল উসূল দ্বীন, পৃঃ ৩০৮-৩০৯; তাজউদ্দীন সুবকি, তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫; জামালুদ্দিন ইসনাভী, তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৭]।

তাঁর লেখা ক'টি গ্রন্থ হচ্ছেঃ

১. কিতাবুর রিআয়া লি হুক্কুকাল্লাহ [আল্লাহর হক্ব পালনের বই]; শায়খুল ইসলাম ঈযজ ইবনে আব্দুস সালাম বইটির উপর ব্যাখ্যা লিখেন [সুবকী এ সম্পর্কে তাঁর তাবাক্বাতাশ শাফিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন]।
২. কিতাবুত তাওয়াহহুম [কল্পনার বই- এতে কিয়ামতের বর্ণনা এসেছে]।
৩. কিতাবুল খাওলা [নির্জনবাসের বই]।
৪. রিসালাতুল মুছতারশিদীন [উপদেশ আগ্রহীদের জন্য আলোচনা]।
৫. কিতাবু ফাহমিল কুরআন [কুরআন বুঝার পুস্তক]।

৬. আল-মাসাইলু ফি আমালিল-ক্বালব ওয়াল জাওয়ারিহি ওয়াল আক্বলি [হৃদয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক কার্যাবলীর মাসাইল]।
৭. কিতাবুল আজাবা [চমৎকারিত্বের পুস্তক]।
[হিশাম কাব্বানি রচিত সালাফীদের বিদআতসমূহের অস্বীকৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (কাজী, ১৯৯৬), পৃঃ ৩০৬]।

ক্বাসিম ইবনে উসমান জুঈ (রাহঃ) [মৃ: ২৪৮ হিজরী]

তিনি ছিলেন দামেস্কের একজন সুখ্যাত অলিআল্লাহ। তিনি সূফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রাহঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইবনে যাওজি (রাহঃ) সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে লিখেন, হযরত জুঈ বলেছেন, তিনি জুঈ নামটি নিয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষুধার্ত থাকার ক্ষমতা দান করেছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে, আর জুঈ অর্থ ক্ষুধার্তের। তিনি আরও বলেছেন, আমি যদি দীর্ঘ একমাস যাবৎই খাবার ছাড়া থেকে যাই তবে এতে কিছু যায় আসে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ অবস্থায় রেখেছ, সুতরাং আমার জন্য তা পূর্ণ করে দাও! [ইবনে যাওজী, সিফাতুস সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০]

তাঁর সম্পর্কে জাহাবী (রাহঃ) তার প্রণীত সিয়ারুল আমলিন-নুবুলা গ্রন্থে লিখেছেন: আল-আব্দী যিনি ক্বাসিম আল-জুঈ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ছিলেন ইমাম, সুফি, মুহাদ্দিস, সুফিদের শায়খ এবং আহমদ ইবনে হাওয়ারীর (রাহঃ) বন্ধু।

ইবনে যাওজী আরো লিখেছেন, ইবনে হাতিম আল-রাজী বলেছেন, হাদীস অনুলেখকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি দামেস্ক গিয়েছিলাম। আমি ক্বাসিম জুঈর একটি মাহফিলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর চতুর্দিকে বসে আছেন। তিনি তখন বক্তৃতা করছিলেন। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে মাহফিলের নিকট দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম তিনি বলছেন: তোমাদের জীবনে পাঁচটি কাজ করোঃ ১. যদি তুমি মানুষের সঙ্গে থাকো তবে কেউ যেনো তোমার উপস্থিতির কথা জানে না। ২. যদি তুমি মানুষের সঙ্গে না থাকো তবে মানুষ যেনো তোমাকে না খুঁজে। ৩. যদি তুমি কিছু জেনে থাকো তা যেনো অন্যরা শোনার জন্য আগ্রহী না হয়। ৪. যদি তুমি কিছু বলো, তাহলে তা যেনো মানুষ গ্রহণ না করে। ৫. যদি তুমি কোন কাজ করো তাহলে তার জন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করো না।

তিনি আরও বললেনঃ আমি তোমাদেরকে আরও পাঁচটি উপদেশ দিচ্ছিঃ ১. তুমি যদি ভুল করো, তাহলে তুমি তা অন্যের নিকট বিনিময় করো না। ২. তোমার প্রশংসা করা হলে, খুশী হবে না। ৩. তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে, মনোক্ষুণ্ন হবে না। ৪. তোমাকে মিথ্যাবাদী বললে, রাগান্বিত হবে না। ৫. তোমার প্রতি প্রতারণা করলে, তুমি পাল্টা প্রতারণা করো না।

ইবনে আবু হাতিম বলেন, দামেস্ক ভ্রমণের মাধ্যমে যতোসব সুফল আমি অর্জন করেছি তার মধ্যে এই বাক্যগুলো ছিলো সর্বাপেক্ষা উপকারী [উপরোদ্ধৃত]।

ইমাম জুনায়িদ বাগদাদী (রাহঃ) [মৃঃ ২৯৭ হিঃ]

তাঁর যুগের ইমাম হযরত জুনায়িদ বাগদাদী (রাহঃ) সুফিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন:

আস-সুফি মান লাবিসাস সুফা আলাস সাফা
[সুফি তিনি যিনি পবিত্রতার উপর পশম পরেন]
ওয়া ইত্তাবাআ তারিক্বাল মুস্তাফা
[মুস্তফার (সাঃ) রাস্তা অনুসরণ করেন]
আতাক্বাল যাসাদা তাআমাল যাফা
[দৈহিক যন্ত্রণা সয়ে, উপাসনায় থাকেন রত বিলাসিতা ভুলে]
ওয়া কানাতাদ দুনিয়া মিনহু আলা ক্বাফা।
[জাগতিক পাওয়ার সবকিছু দূরে দেন ঠেলে] [আলিফুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আছাদ ইয়াফিঈ [মৃঃ ৭৬৮ হিঃ], নাসরুল মাহাসিনিল গ্বালিয়া ফি ফজলি মাশায়িখিস সুফিয়্যা (বৈরুত: দার সাদর, ১৯৭৫)]

হযরত জুনায়িদ বাগদাদীর প্রখ্যাত গ্রন্থ কিতাব দাওয়াইল আরওয়াহ [আত্মার উপশমের কিতাব] এ জে আরবেরী ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। [আল-জুনায়িদ বাগদাদী, কিতাব দাওয়াইল আরওয়াহ, ইডি, এন্ড ট্রা, এ জে আরবেরী ইন জার্নাল অফ দ্যা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৩৭)।]

হাকীম আল-তিরমিযী [মৃঃ ৩২০ হিজরী]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী হাকীম আল-তিরমিযী আল-হানাফী [তিনি প্রখ্যাত হাদীস সংকলক আবু ঈসা তিরমিযী নন] ছিলেন খোরাশানের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি তাসাওউফের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখালেখির উপর প্রখ্যাত গবেষক শায়খুল আকবর ইবনে আরাবী (রাহঃ) মন্তব্য করেছেন। হাকীম আল-তিরমিযী (রাহঃ) যেসব বই-পুস্তক লিখেছিলেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত ক'টির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

১. মাসাইলুল মাকনুনা [সুপ্ত ব্যাপার]
২. আদাবুন-নাফস [নফসের আদাব]
৩. আদাবুল-মুরিদীন [মুরিদদের আদাব]
৪. আমসালু ম্মিনাল কিতাবিস-সুন্নাহ [কুরআন-সুন্নাহর উপমাসমূহ]
৫. আসরারু মুজাহাদাতিন নাফস [নফসের সঙ্গে সংগ্রামের রহস্য]
৬. ইলমুল আউলিয়া [আউলিয়াদের জ্ঞান]
৭. খাতামুল বিলায়াত [বিলায়েতের নিদর্শন]
৮. শিফাউল ঈলাল [ভ্রান্তির উপশম]
৯. কিতাবু মা'আরিফাতিল আসরার [ইলমে মা'আরিফাতের রহস্যের বই]
১০. কিতাবুল আ-দা আন নাফসি ওয়াল আক্বলি ওয়াল হাওয়া [দুশমনদের পুস্তক, নফস, মন ও খাহিশাত]
১১ আল-মানহিয়্যাত [নিষেধাজ্ঞা]
১২ নাওয়াদিরুল উসূলি ফী মা'আরিফাতি আহাদিছির রাসূল [রাসূল [সাঃ]-এর বিরল হাদীসের জ্ঞান]
১৩ আল-কালামু আলা মা-না, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ [লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ] [হিশাম কাব্বানি রচিত সালাফীদের বিদআতসমূহের অস্বীকৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (কাজী, ১৯৯৬), পৃঃ ৩০৬]।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাহঃ) [৪৫০ - ৫০৫ হিজরী]

ইসলামের প্রমাণ ইমাম আবু হামিদ তুসী আল-গায্যালী (রাহঃ) ছিলেন ৫ম হিজরী সনের মুজাদ্দিদ। তিনি ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। ইলমে তাসাওউফের উপর তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হলো এহইয়াউ উলূমিদ্দীন [ধর্মবিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ]। আত্মজীবনীমূলক তাঁর মুনক্বিদ মিনাদ-দ্বালাল গ্রন্থে লিখেনঃ গ্বাইরুল্লাহ থেকে হৃদয়কে পরিষ্কার করার পন্থা হচ্ছে সুফিদের তরীকা। আমি এ

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সুফিরা আল্লাহর রাস্তার পথিক, তাদের কার্যাবলী হলো সর্বোত্তম আমল, তাদের রাস্তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক রাস্তা এবং তাদের চরিত্র সর্বোত্তম চরিত্র। তারা তাদের হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে পরিষ্কার করেছেন এবং তাদের অন্তরকে নদীর প্রবাহের জন্য প্রস্তুত করেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান প্রবাহিত হয়। [আল-গায্যালী, আল-মুনক্বিদ মিনাদ-দ্বালাল, পৃঃ ১৩১]

ইবনে আযিবা তাঁর ইক্বাজুল হিমাম গ্রন্থে বলেন, আল-গায্যালী তাসাওউফকে ফরযে আইন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ তাসাওউফ অর্জন বা তাসাওউফের রাস্তায় অগ্রসর প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব, কারণ একমাত্র নবী-রাসূলরা ব্যতীত সাবাই আভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি [আত্মিক রোগ] থেকে মুক্ত নয়। [ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম, পৃঃ ৮]

আবুল হাসান আলী ইবনে উসমান জুল্লাবী হুজভেরী (রাহঃ) [মৃঃ ৪৬৪ হিজরী]

হযরত হুজভেরী (রাহঃ) বর্তমান আফগানিস্তানের গযনীর অধিবাসী ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশফ আল-মাহযুব [পর্দা উন্মুক্তকরণ] সুফি সাহিত্যের এক অনন্য অবদান বলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তাঁর সমকালীন আবু সাঈদ হুজভেরী নামক একজন সুফির কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে কাশফুল-মাহযুব হচ্ছে তাসাওউফের উপর ফারসী ভাষার প্রথম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর পরবর্তীতে হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) মান্তিকুত তায়ির ও তাজকিরাতুল আওলিয়া গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। আর এর আরও বেশ পরে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রাহঃ) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মসনবী মা'নবী রচনা করেন।

কাশফুল-মাহযুব-এ হযরত হুজভেরী (রাহঃ) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাসাওউফের বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

তাসাওউফের পরিচিতি পর্বে তিনি বিভিন্ন সুফিদের উদ্ধৃতি তলে ধরেন। তিনি লিখেন, সুফি উপাধিটি অতীতে এবং বর্তমানে ঐসব লোকদের দেয়া হয়েছে যারা উচ্চ পর্যায়ের আরিফ ও আউলিয়া। একজন শায়খ বলেছেন, যে প্রেমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেছে সে-ই হচ্ছে পবিত্র, এবং যে প্রেমাস্পদের মধ্যে বিলীন হয়েছে এবং

সবকিছু পরিত্যাগ করেছে সে-ই সুফি। [হুজভেরী, কাশফ আল-মাহযুব, ইংরেজী অনুবাদ, আরএ নিকলসন, দারুল ইশাআত, উর্দু বাজার, করাচী, ১৯৯০ সন, পৃঃ ৩৪]

হযরত হুজভেরী (রাহঃ) তাসাওউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর পূর্বেকার যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ সুফির উক্তি বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে সেসব উক্তি ও তাঁর মন্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

হযরত যুন্নুন মিশরী (রাহঃ) বলেন: সুফি সেই ব্যক্তি যার মুখের কথা তার অবস্থার বাস্তবতা প্রকাশ করে, অর্থাৎ সে কিছুই বলে না, যা সে নয়। হযরত আবুল হাসান নূরী (রাহঃ) বলেন: তাসাওউফ হচ্ছে সকল ব্যক্তিগত আনন্দ-উপভোগের বিসর্জন। এই বিসর্জন হচ্ছে দু'ধরনের: আনুষ্ঠানিক এবং জরুরী। যেমন কেউ যদি আনন্দকে বিসর্জনের মাধ্যমে আনন্দ উপলব্ধি করে তাহলে এটা হলো আনুষ্ঠানিক বিসর্জন। কিন্তু আনন্দদায়কতা স্বয়ং নিজেই যদি তাকে বিসর্জন দেয় তাহলে এই আনন্দ বিলীন হয়ে গেলো। অর্থাৎ তার নিকট আনন্দ-বিলাস মোটেই আর উপভোগ্য কিছু থাকে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় একমাত্র মুশাহাদার মাধ্যমে। সুতরাং ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা হচ্ছে মানুষের কর্ম কিন্তু তা বিলীন করা হলো আল্লাহর কাজ। মানবের কর্ম বাহ্যিক ও রূপক। অপরদিকে আল্লাহর কাজ হলো বাস্তব।

হযরত আবু আমর দামেস্কী (রাহঃ) বলেছেন: তাসাওউফ হলো এই: দুনিয়ার অপূর্ণতাকে দেখা- বরং দুনিয়ার চাকচিক্যতার উপর দৃষ্টি না দেওয়া। যে কেউ দুনিয়ার প্রতি অন্ধ হয়েছে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হয়েছে। হযরত আবু বকর শিবলী (রাহঃ) বলেছেন: তাসাওউফ হচ্ছে গ্বাইরুল্লাহর কবল থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখা। কারণ গ্বাইরুল্লাহ বাস্তবে অনস্তিত্বশীল। অর্থাৎ গ্বাইরুল্লাহকে বাস্তব ভাবা শিরকের সমান। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাহঃ) বলেছেন: তাসাওউফ হলো ভালো জিনিসের বিন্যস্তকরণ; যে যতো বেশী বিন্যস্ত করেছে সে ততো বেশী উত্তম সুফি হয়েছে। ভালো জিনিসের বিন্যাস দু'ধরনের: প্রভুর প্রতি ও মানুষের প্রতি বিন্যস্তকরণ। প্রথমটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি এবং দ্বিতীয়টি সমাজের প্রতি।

হযরত জুনায়িদ বাগদাদী (রাহঃ) বলেছেন: তাসাওউফ আটটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত যা আটজন প্রসিদ্ধ নবীর (আঃ) গুণাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১. ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্য, যিনি তাঁর পুত্রকে কুরবানী করেছেন; ২. ইসমাঈল (আঃ)-এর পূর্ণসম্মতি,

যিনি আল্লাহর নির্দেশকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন; ৩. হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ধৈর্যশীলতা, যিনি ভীষণ ধৈর্যসহকারে দেহের উপর কীটের আক্রমণকে মেনে নিয়েছিলেন; ৪. হযরত জাকারিয়্যা (আঃ)-এর প্রতীকীত্ব, যার প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দেন: তুমি তিন দিনের জন্য মানুষের সঙ্গে ইঙ্গিত ছাড়া কোন কথা বলবে না [৩ঃ৩৬] এবং যখন সে তাঁর প্রভুকে গোপনে ডাক দিল [১৯ঃ২]; ৫. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিস্ময়তা, যিনি ছিলেন তাঁর নিজের দেশে প্রবাসী এবং যাদের সঙ্গে থাকতেন তারাই তাঁকে চিনতো না; ৬. হযরত ঈসা (আঃ)-এর তীর্থ, যিনি এতোই তারিকে দুনিয়া ছিলেন যে একটিমাত্র পানপাত্র ও চিরুনী ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে রাখতেন না। এরপর পানপাত্রটি তিনি ছুঁড়ে ফেললেন যখন দেখলেন একব্যক্তি অঞ্জলির মাধ্যমে পানি পান করছে এবং চিরুনীও একদিন দূরে ফেলে দিলেন যখন দেখলেন অপর এক লোক নিজের আঙ্গুল দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে; ৭. হযরত মূসা (আঃ)-এর পশমের কাপড়; যিনি সর্বদাই এই পশমের কাপড় পরিধান করতেন; এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীনতা, যার প্রতি আল্লাহ পাক জগতের সকল সম্পদের চাবি দিয়েছিলেন এই বলে: নিজের প্রতি কোন অত্যাচার না করে যা চাও তা গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তিনি জবাব দিলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমি এগুলো পাওয়ার ইচ্ছা করি না; আমাকে একদিন আহার করাও ও একদিন উপবাসে রাখো। এগুলো হচ্ছে উত্তম আচরণ।

মুহাম্মদ বিন আহমদ মুরক্বী (রাহঃ) বলেছেন: আল্লাহর সাথে সঠিক আহ্বানের মধ্যে নিজেকে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখার নাম তাসাওউফ। [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮-৪১]

হযরত হুজভেরী (রাহঃ) গ্রন্থের শেষ ১১টি পরিচ্ছেদে দ্বীনের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর আভ্যন্তরীণ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এগুলোকে তিনি পর্দার উন্মুক্ততা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ১১টি বস্তু হলো: ১ আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান [ইলমে মা'আরিফাত], ২. আল্লাহর একত্ব [তাওহিদ], ৩ বিশ্বাস [ঈমান], ৪. পবিত্রতা [তাহারাত], ৫. নামায [সালাত], ৬. দান [যাকাত], ৭. রোযা [সাওম], ৮. হাজ্জ, ৯. সাহচর্য ও এর নীতি-নৈতিকতা, ১০. তরীকতের রাস্তার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এবং ১১ ওজদ [দুঃখ], ওজুদ [আনন্দ], তাওয়াজ্জুদ [দুঃখের মাধ্যমে আনন্দ], সামা [কবিতা আবৃত্তি] ও খিরক্বা পরা ইত্যাদি।

ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশায়রী (রাহঃ) [মৃঃ ৪৬৫ হিঃ]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশায়িরী (রাহঃ) নিশাপুর নামক স্থানে হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। তিনি মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এতে তাঁর জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে উঠে। তিনি জীবন রক্ষার্থে মক্কা মুয়াজ্জমায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সুফি আবু আলী দাক্কাক্ব (রাহঃ)-এর শিষ্য। তিনি কুরআন শরীফের একটি পূর্ণ তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের নাম হলো, লাতাইফাতুল ইশারাতি বি তাফসীরিল কুরআন। তবে তাঁর রচিত সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম হলো, রিসালা ইলাস সুফিয়্যা [সুফিদের প্রতি পত্র]। এটা হচ্ছে তাসাওউফের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার কিতাব। আবু নাসির সাররায [মৃঃ ৩৭৮ হিঃ] এর কিতাবুল লুমআ [আলোর পুস্তক], আবি তালিব মক্কী [মৃঃ ৩৮৬ হিঃ] এর ক্বুতুল ক্বুলুবি ফি মুআমালাতিল মাহবুব ওয়া ওয়াসফু তারিক্বিল মুরীদ ইলা মাক্বামিত-তাওহিদ [প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্য ক্বলবের খোরাক এবং তাওহিদের স্বীকৃতির স্তরে উপনিত হওয়ার রাস্তার বর্ণনা] এবং কুশায়রী (রাহঃ) এর রিসালা ইলাস সুফিয়্যা কিতাবের সমমানের গ্রন্থ। এছাড়া আবু বকর কালাবাদী [মৃঃ ৩৯১ হিঃ] এর তাআররুফ লি মাযহাবি আহলিত তাসাওউফ [তাসাওউফপন্থীদের মাযহাবের ব্যাখ্যা] এবং আব্দুর রহমান সুলামী [মৃঃ ৪১১] এর তাবাক্বাতুস সুফিয়্যা [সুফিদের জীবনের স্তরসমূহ] সে সময়কার তাসাওউফের উপর রচিত সমপর্যায়ের গ্রন্থাবলী।

আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ হাওয়ারী আল-আনসারী (রাহঃ) [মৃ: ৪৮১ হিজরী]

হযরত আনসারী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সূফী শায়খ, হাদীসের হাফিজ, মুফাস্সীর। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি বিদআতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর তরীকতের মুর্শিদ ছিলেন হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানী (রাহঃ) [মৃ: ৪২৫ হিজরী]। হযরত খাজা খিরকানী (রাহঃ) ছিলেন প্রাথমিক যুগের নকশ্বন্দিয়া তরীকার কুতুব।

হযরত আনসারী (রাহঃ) সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক হযরত জাহাবী (রাহঃ) তাঁর তারিখুল ইসলাম এবং সিয়ারু আ-লামিন নুবুলা গ্রন্থদ্বয়ে, হযরত ইবনে রাজাব (রাহঃ) তাঁর তাবাক্বাতুল হানাবিলা গ্রন্থে এবং হযরত জামী (রাহঃ) তাঁর ফারসী ভাষার গ্রন্থ মানাক্বিবু শায়খিল ইসলাম আনসারী-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত আনসারী সুফিতত্ত্বের উপর অনেক বই লিখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'টি হলোঃ

১. মানাযিলুস-সাঈরীন- এই গ্রন্থের উপর ইবনুল ক্বাইউম (রাহঃ) একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন যার নাম হলো মাদারিজুস-সালিকীন।

২. তাবাক্বাতুস সুফিয়্যা [সুফি শায়খদের জীবনীগ্রন্থ]।

৩. কিতাব ইলাল মাক্বামাত [তরীকতের স্তর সম্পর্কে আলোচনা]।

৪. কিতাব সদ ময়দান, ফারসী ভাষায় লিখিত [একশ মাঠের বই], এটা একটি কবিতার বই। এতে হযরত আনসারী (রাহঃ) এর বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত আনসারী (রাহঃ) সুফিদের তরীকা সম্পর্কে আফগানিস্তানের হিরাতে বক্তব্য প্রদান করতেন।

৫. কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, ফারসী ভাষায় লিখিত, দশটি খণ্ডে সমাপ্ত, এতে আনসারী (রাহঃ)-এর কুরআনের তাফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আবুল ওয়াফা ইবনে আক্বিল হাম্বলী (রাহঃ) [মৃঃ ৫১৩ হিজরী]

হযরত হারাবী আল-আনসারী (রাহঃ)-এর মতো তিনিও হাম্বলী মাযহাবের একজন ফক্বীহ ও হাফিজ ছিলেন। তিনি সুন্নাহ ও তাসাওউফের রক্ষক হিসেবে পরিচিত। ইমাম আহমদ (রাহঃ)-এর চিন্তা-গবেষণাকে তিনিই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তবে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বীর অনুসারীরা ছিলেন বলে জানা যায়। সে সময়কার অন্যান্য সুফিয়ায়ে কেরাম যেমন, হযরত ইবনে কুদামা [৬২০ হিঃ] ও হযরত তুফী [৭১৫ হিঃ], এদের মতো হযরত ইবনে আক্বিল (রাহঃ), হযরত মনসুর হাল্লাজ (রাহঃ)-কে একজন উচ্চপর্যায়ের অলি হিসেবে গণ্য করতেন। হযরত ইবনে যাওজি (রাহঃ) বলেন, তাঁর কাছে হযরত আক্বিল (রাহঃ)-এর হাতের লিখা একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিলো যাতে তিনি হাল্লাজ (রাহঃ) সম্পর্কে প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করেন। যার নাম ছিলো, জুয ফী নাসরি কারামাতিল হাল্লাজ। ইবনে আক্বিল অনেক বই পুস্তক লিখেছিলেন। কিতাবুল ফুনুন নামক একটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন যার মধ্যে আটশত খণ্ড ছিলো বলে কথিত আছে। [ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, জর্জ মাক্বদিসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিরোনাম, ইবনে আক্বিল]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহঃ) [৫৪৪ - ৬০৬ হিঃ]

ইমাম রাযী (রাহঃ) সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক নূহ-হা-মীম কেলার লিখেন: তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ প্রতিভাবান ইমাম ও মুজতাহিদ। তাঁর যুগের তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সমসাময়িক মুতাজিলা, শিয়া ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার আক্বীদার সম্মুখে আহলুস সুন্নাহর হক্ব আক্বীদাকে সমুন্নত রাখেন। [নূহ কেলার, রিলায়ান্স অফ দ্যা ট্রেভেলার্স, পৃঃ ১০৪৬]

ইমাম রাযী (রাহঃ) তাঁর ইতিক্বাদাতু ফিরাক্বিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন গ্রন্থে লিখেন: সুফিরা যা বলেন তার সারমর্ম হলো, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের রাস্তা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ পরিহার এবং এটাই সর্বোত্তম পন্থা। সুফিরা অনুশোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হন এবং নিজেদেরকে সর্বাবস্থায় বস্তুতান্ত্রিক ফাঁদ থেকে মুক্ত রাখেন। তারা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ রাখেন। এ স্মরণ থেকে জাগতিক কোন কিছুই তাদেরকে গাফিল রাখতে পারে না। আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে তাদের চারিত্রিক পবিত্রতাই সুফিদের পরিচিতি সমুন্নত রেখেছে। আর অবশ্যই, মানবগোষ্ঠির মধ্যে এরাই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম দলের লোক। [ফখরুদ্দীন রাযী, ইতিক্বাদাতু ফিরাক্বিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃঃ ৭২-৭৩]

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) [মৃঃ ৫৬১ হিঃ]

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) ছিলেন সুফিকুল শিরোমণি এবং কুত্বে আলম। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন সুখ্যাত ফকীহ। এছাড়া শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর তরীকতের একাধিক শিক্ষক ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবুল খায়ির হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস (রাহঃ) [মৃঃ ৫২৫ হিঃ] এবং হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামাদানী (রাহঃ) [মৃঃ ৫৩৫] যিনি ছিলেন আবুল হাসান খারক্বানী (রাহঃ)-এর খলীফা, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) -এর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে:
১. গুনিয়া লি তালিবী তারীকিল হাক্ব (সত্যপথে আগ্রহীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি); এই গ্রন্থে তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ)-এর শিক্ষাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেন এবং এতে সন্নিবেশিত হয়েছে আহলুস সুন্নাহর আক্বীদা ও ইলমে তাসাওউফের বিভিন্ন দিক।

২. ফাতহুর রাব্বানী [প্রতিপালকের [প্রতি] উন্মুক্ত]; সুফি ও সালিকদের জন্য বক্তব্যের সংকলন; বইটির শিরোনাম এর লেখা স্বার্থক করেছে। এটা পাঠ করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সত্যিই সহায়ক হয়।
৩. ফুতুহুল গ্বায়িব [গায়েবের উন্মুক্ততা]; এটাও একটি ওয়াজের সংকলন। উপরোক্ত বই থেকেও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই বইটি আরও উচ্চ পর্যায়ের। এটাও একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। দু'টোই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর শুধু ভক্ত ছিলেন না, তাঁর তরীকার (কাদিরীয়া) একজন শায়খ ছিলেন। তিনি তাঁকে আমার শায়খ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত জিলানী (রাহঃ) ও হযরত দাব্বাস (রাহঃ)-কে সে যুগের প্রসিদ্ধ সুফি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং ইবনে তাইমিয়্যা সুফিবিরোধী কিংবা তাসাওউফ বিরোধী ছিলেন বলে যারা যাকিছু প্রচার করে তা মূলতঃ ভিত্তিহীন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর (রাহঃ) বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে বলে প্রমাণ মিলে। এর একটি এই ছিলো যে, তাঁর মাহফিলে একদা হাজার হাজার অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ওয়াজ শেষে এরা সকলে একসঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান। তাঁর কারামতগুলো আল-শাত্তানাওফী তাঁর 'বাহযাতুল আসরার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি ঘটনা বর্ণনাকারীদের তালিকাসহ লিপিবদ্ধ করেন। ইবনে তাইমিয়্যা এসব বর্ণনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁর শিষ্য জাহাবী এগুলোর মধ্যে অনেকটি বিশ্বাস করেন নি, যদিও আউলিয়াদের কারামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন না। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য হলো: শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী: তিনি শায়খ, ইমাম, স্কলার, জাহিদ, প্রাজ্ঞ, ব্যাখ্যাতা, শায়খুল ইসলাম, আউলিয়াকুল শিরোমণি, হাম্বলী মাযহাবপন্থী, বাগদাদের শায়খ। আমি বলি, বড় বড় শায়খদের মধ্যে তাঁর মতো উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক স্তরে উপনিত ও কারামতের অধিকারী কেউ ছিলেন না। কিন্তু এর (কারামতের) অনেকটাই অলীক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভবও।

ফাতওয়া হাদিসীয়া গ্রন্থের লেখক হযরত হাইছামী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) এবং হামাদানী (রাহঃ) এর মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। হাইছামী লিখেন: শাফিঈ মাযহাবের ইমাম আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আসরুন [মৃঃ ৫৮৫] বলেন: আমি যখন প্রথম ধর্মজ্ঞানের সন্ধান শুরু করি তখন আমার সাথী হযরত ইবনে

সাক্বারের সঙ্গেই কালাতিপাত করতে থাকি। তিনি তখন নিযামিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি একদিন বললেন, অলিআল্লাহদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের একটি রেওয়াজ। এসময় বাগদাদে ইউসুফ হামাদানী নামক এক ব্যক্তি বসবাস করতেন যিনি আল-গাওস নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে তিনি প্রয়োজনে আত্মপ্রকাশ করতেন আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের। আমার সাথে যোগ দিলেন হযরত ইবনে সাক্বার ও আব্দুল কাদির জিলানী যিনি তখনও একজন যুবক মাত্র। ইবনে সাক্বার বললেন, আমরা যখন শায়খ ইউসুফ আল হামাদানী (রাহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো তখন আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন কবরো যা সম্পর্কে তাঁর কোনো পূর্ব ধারণাই থাকবে না। আমি বললাম, আমিও একটি প্রশ্ন তাঁকে করবো এবং দেখবো তিনি কি উত্তর দেন। কিন্তু শেখ আব্দুল কাদির জিলানী বললেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ হামাদানীর মতো মহান ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা থেকে আমাকে বিরত রাখো, তবে আমি অবশ্য তাঁর সামনে গিয়ে বরকত এবং ঐশি জ্ঞান অর্জনের জন্য দু'আর অনুরোধ করবো।

আমরা তাঁর খানাকায় প্রবেশ করলাম। কিন্তু নিজেকে অনেক সময় যাবৎ আমাদের সঙ্গে দেখা করা থেকে বিরত রাখলেন। এরপর দেখা হওয়ার পর তিনি ইবনে সাক্বার দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, হে ইবনে সাক্বার! কোন সাহসে তুমি আমাকে আটকানোর নিয়াতে প্রশ্ন করার ইচ্ছা করলে? তোমার প্রশ্ন ও এর উত্তর হচ্ছে এই-এই! এরপর তিনি আরও বললেন, তোমার হৃদয়ে আমি বিশ্বাসহীনতার আগুন জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি। এবার তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমিও আমাকে প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষা করবে? তোমার প্রশ্ন এই এবং এর উত্তর এটা। মানুষকে তোমার প্রতি দুঃখিত হতে দাও কারণ, আমার প্রতি তোমার এই অবজ্ঞার ফলে তুমি সফলতা থেকে বঞ্চিত হবে। এরপর তিনি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর দিকে তাকালেন ও বললেন, হে আব্দুল কাদির! তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছো, আমার প্রতি তোমার উত্তম শ্রদ্ধার মাধ্যমে। আমি দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে তুমি বাগদাদের সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করে মানুষকে হিদায়াতের রাস্তায় আহ্বান করবে এবং বলবে আমার পা প্রত্যেক ওলীর গর্দানে! এবং আমি প্রায় দেখতেই পাচ্ছি তোমার যুগের প্রত্যেক অলী তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে এবং বড়ত্বের স্বীকৃতি দেবে।

ইবনে আবি আসরুন আরো বলেন: আব্দুল কাদির জিলানীর সুনাম অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে এবং শায়খ হামাদানী যা বলেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়। একদা আব্দুল কাদির জিলানী সত্যিই বলেছিলেন, সকল ওলীর কাঁধে আমার পা, এবং তিনি সত্যিই তাঁর

যুগের কুতুব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে হিদায়াতের নূর।

ইবনে সাক্বারের অবস্থা ছিলো ভিন্ন। তিনি শরীয়তের জ্ঞানে মেধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সময়ের সকল স্কলারদের উপর তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং তিনি সফলভাবে বিভিন্ন স্কলারদের সঙ্গে বাহাস করে চলতেন। এরপর খলিফার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠে। একদিন খলিফা তাঁকে দূত হিসেবে বাইজান্টিয়ামের সম্রাটের কাছে পাঠালেন। এদিকে সম্রাট তাঁর সঙ্গে বাকযুদ্ধের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টধর্মের বড় বড় পাদ্রী ও স্কলারদের সমবেত করলেন। কিন্তু ইবনে সাক্বারের যুক্তির সম্মুখে সবাই হেরে গেলো। তার সামনে তাদের সবাইকে মনে হলো যেনো, শিক্ষকের সাথে ছাত্ররা।

বাইজান্টিয়ামের সম্রাট তাঁর প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করলেন। সেখানে ইবনে সাক্বার সম্রাটের সুন্দরী মেয়েকে দেখে সাথে সাথে তার প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রাজকুমারী তা অস্বীকার করলো, তবে সে ইবনে সাক্বারকে এই বলে আশ্বাস প্রদান করলো যে, যদি তিনি তার ধর্মে [খৃস্টবাদে] দীক্ষিত হতে রাজী হন তাহলে সে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ফেললেন খৃষ্টান রাজকুমারীকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আশায়। কিন্তু বিয়ের পরই তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজকুমারী তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিল। এরপর তিনি ক্ষিদের জ্বালায় শহরের রাস্তায় রাস্তায় খাবার চেয়ে সবার নিকট ভিক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই তাকে কিছু দিলো না। ইবনে সাক্বারের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলো। তিনি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখতে পেলেন।

একদিন একজন পরিচিত ব্যক্তি তাকে দেখতে পেলো। লোকটি বলেন: আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, একটি লোভের কারণে আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি। লোকটি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পবিত্র কুরআন শরীফের কোনো কিছু আপনার মনে পড়ছে কি? তিনি জবাব দিলেন, আমার শুধু মনে পড়ছে, রুব্বামা ইয়াওয়াদ্দুল লাজিনা কাফারু লাও কানু মুসলিমীন- যারা অবিশ্বাসী তারা বার বার ইচ্ছা করবে যে, তারা কেন মুসলমান ছিলো না [১৫ঃ২]।

ঐ লোকটি আরও বলেন, ইবনে সাক্বার মুমূর্ষু অবস্থায় উপনিত হলেন। তার দেহে ভীষণভাবে কম্পন শুরু হয়েছে। আমি তাকে কাবা শরীফের দিকে ফিরালাম। কিন্তু

তিনি বার বার পূর্ব দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। তৃতীয়বারের মতো আমি তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম, কিন্তু এবারও তিনি নিজেই পূর্বদিকে ফিরে গেলেন। এরপর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার অলি ইউসুফ হামাদানীর প্রতি অবমাননার এটাই ফলাফল।

ইবনে আবি আসরুর আরও বলেন, আমি দামেস্ক চলে গেলাম। সেখানকার শাসনকর্তা নুরুদ্দিন শহীদ আমাকে ধর্মবিষয়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং আমি তা গ্রহণ করে নেই। এর ফলে দুনিয়া প্রতিটি দিক থেকে প্রবেশ করতে লাগলো: মওজুদ, পুষ্টি, যশ, টাকা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি সবকিছুই আমার পরবর্তী জীবনভর স্থায়ী হয়ে গেল। আর গওস ইউসুফ হামাদানী এ অবস্থারই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। [আল-হাইছামী, ফাতওয়া হাদিসীয়া, পৃঃ ৩১৫-৩১৬]

ইমাম নববী (রাহঃ) [৬২০ - ৬৭৬ হিঃ]

ইমাম নববী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সুফি স্কলার। শেষ যুগের একজন মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম হলো শায়খুল ইসলাম ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ নববী। সে যুগের শাফিঈ মাযহাবের দু'জন প্রসিদ্ধ আলীমের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অপরজন হলেন ইবনে রাফিঈ (রাহঃ)।

ইমাম নববীর গ্রন্থাবলী শরীয়ত, কুরআন চর্চা এবং হাদীস চর্চার পদ্ধতির একেকটি উজ্জ্বল আদর্শ। ইবনে হাজার আসকালানী (রাহঃ)-এর বুখারী শরীফের শরাহ ফাতহুল বারী যেরূপ প্রসিদ্ধ তদ্রুপ ইমাম নববীর মুসলিম শরীফের শরাহও সর্বজনস্বীকৃত একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর চল্লিশ হাদীস সংকলন এতো বেশী পঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে, হয়তো অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের ক্ষেত্রে এরূপ হয়নি। এ সংকলনটি থেকে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মুসলমান উপকৃত হয়ে আসছেন।

ইমাম নববী একজন সুফি-দরবেশ ছিলেন। তাঁর একাধিক পুস্তকের শিরোনাম থেকেই এর প্রমাণ মিলে। হযরত শাখাওয়ী ইমাম নববীর জীবনী লিখেছিলেন। এ গ্রন্থটির শিরোনাম হলে তারযামাত শায়খুল ইসলাম, কুতুবুল আউলিয়াল কারীম, ফকীহুল আনাম, মুহিউস সুন্নাহ ওয়া মুমিতুল বিদআ আবি জাকারিয়্যা মুহিউদ্দিন নববী।

ইমাম নববী তাঁর ছোট্ট একটি গ্রন্থ মাক্বাদিসী ফিত-তাওহিদ ওয়াল ইবাদা ওয়া উসূলুত-তাসাওউফ-তে লিখেন: সুফিদের রাস্তার মূলে সুনির্দিষ্টভাবে ৫টি জিনিষ বিদ্যমান: ১. মানুষের সঙ্গে থাকার সময় এবং নির্জনে আল্লাহকে হৃদয়ে স্থায়ী করে রাখা; ২. কাজে ও কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ; ৩. মানুষের সংসর্গ পরিত্যাগ করা ও তাদেরকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা; ৪. আল্লাহ তোমাকে যাকিছু দান করেছেন- তা কম হলেও এতে সন্তুষ্ট থাকা; ৫. সর্বদা তোমার ব্যাপার-স্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা। [হা-মীম-নূহ কেলার, আল-মাক্বাদিস: ইমাম নববীর ইসলামের মেন্যুয়েল (ইভেনন: সুন্নাহ বুকস, ১৯৯৪) পৃঃ ৮৫-৮৬]

ইলমে তাসাওউফের বুসতানুল আরিফীন ফিল-জুহুদ ওয়াত তাসাওউফ নামক একটি বই লিখে পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তবে বইটি পরবর্তীতে প্রকাশ হয়। এতে ইমাম নববী আগেকার যুগের প্রসিদ্ধ সুফিদের কিছু অমূল্য বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। আমরা বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন: একমাত্র মুখলিছ ব্যক্তিরা [বিশ্বস্তরা] জানেন রিয়া [দর্শনেচ্ছু] কোন জিনিসকে বলে। এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুখলিছ হতে চায় সে ছাড়া অন্যদের পক্ষে রিয়া ও গুপ্ত স্বরূপ কোন জিনিষ তা বুঝে ওঠা একরূপ অসম্ভব। একমাত্র ওরাই এটা জানতে সক্ষম হয় যারা নিজেদের মধ্যে দীর্ঘকাল সাধনা করে এর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এটা সবার জন্য সম্ভব নয়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিই যদি মনে করে, সে রিয়া কোন জিনিষ বুঝে ফেলেছে তাহলে এটা অবশ্যই তার অজ্ঞতার কারণ।

[ইমাম নববী বলেন] যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এই পুস্তকে আমি একটি পরিচ্ছেদ যোগ করবো যার মাধ্যমে [পাঠের পর] আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। রিয়া যে কী গভীরভাবে মানুষের মধ্যে গুপ্ত থাকে তার একটি ধারণা আমরা পাবো মহান শিক্ষক ও ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশায়িরী (রাহঃ)-এর একটি বর্ণনা থেকে। তিনি তাঁর রিসালা গ্রন্থে বলেন: আমি মুহাম্মদ ইবনে হুসাইনকে বলতে শুনেছি: [তিনি বলেন] আমি আহমদ ইবনে আলী ইবনে জাফরকে বলতে শুনেছি: [তিনি বলেন] আমি হাসান ইবনে আলাওয়িয়্যাকে বলতে শুনেছি: [তিনি বলেন] আবু ইয়াজিদ [বায়িজিদ বিস্তামী] (রাহঃ) বলেছেন: আমি দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ আমার নফসের কামার [হাদ্দাদু নাফসী] বা লৌহকর্মকার ছিলাম, এরপর পাঁচ বছর যাবৎ আমি আমার ক্বলবের আরশি [মিরআতু ক্বালবী] হয়ে গেলাম। এরপর এক বছর কাটালাম দুটির [অর্থাৎ নফস ও ক্বলবের]

মধ্যখানে কি আছে তা অবলোকন করতে। আমি দেখতে পেলাম আমার চতুর্দিকে অবস্থান করছে একটি দৃশ্যমান বেল্ট [অর্থাৎ কুফরের বেল্ট- তখনকার দিনে ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী বসবাসকারীদের কোমরে একটি বেল্ট থাকতো]। সুতরাং এটাকে কেটে দিতে আমি আরও বারো বছর [সাধনায়] কাটালাম এবং দেখতে পেলাম আমার চতুর্দিকে আরেকটি গুপ্ত বেল্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। এবার আমি আরও পাঁচ বছর অতিবাহিত করলাম এটাকে কেটে দিতে। এরপর আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো [কুশিফা লি] এবং আমি সমগ্র সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, সবকিছুই মৃত। সুতরাং আমি তাদের উপর জানাযার দুআ পাঠ করলাম।

[ইমাম নববী বলেন] আমি বলি: রিয়া যে কতো দুর্বোধ্য ও গভীরে বাস করে তার বর্ণনা এই রাস্তার [অর্থাৎ তাসাওউফের] গুরুজনের কাছ থেকে পরিষ্কার হয়েছে। তাঁর বাক্য: আমি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, সবই মৃত- এ কথাটি অমূল্য রত্ন ও কতো সুন্দর। একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কণ্ঠের বাণী ব্যতীত এরূপ মহামূল্যবান অর্থপূর্ণ কথা খুব অল্পজনের মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে। এর অর্থ হচ্ছে তিনি দীর্ঘদিন সাধনার পর যখন নিজের নফসকে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্যশীল করে ফেললেন তখনই তাঁর আভ্যন্তরীণ অবস্থা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি তখন সৃষ্ট বস্তুর দিকে তাকিয়ে তাদের মৃত ও সম্পূর্ণ শক্তিহীন দেখতে পেলেন:

তারা না পারে ক্ষতিসাধন না পারে লাভবান করতে;
তারা না পারে দিতে কিছু না ধরে রাখতে;
তারা না পারে জীবনদান না পারে মৃত্যু দিতে;
তারা না পারে টানতে না পারে কেটে দিতে;
তারা না পারে কাছে আনতে না পারে দূরে ঠেলে দিতে;
তারা না পারে খুশী করতে না পারে বেদনা দিতে;
তারা না পারে আরোপিত না পারে বঞ্চিত করতে;
তাদের কাছে না আছে সুফল না আছে বিফল,
না দিতে জানে মৃত্যু, না জীবন, না পুনরুত্থান।

এটাই তাহলে, মানুষের মৃত্যুকে বুঝায়: উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে মৃত্যু সমতূল্য বলা হয়েছে। এভাবেই মৃতদের ধারণা করা হয়।

[ইমাম নববী এরপর আরও কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে উপসংহারে বলেন], মোটকথা, তারা [সৃষ্ট জীব] উপরোক্ত দিকগুলোর ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন। তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ, তাঁর আইনে আবদ্ধ ও পালনকারিতার মধ্যে অস্তিত্বশীল। যে কেউ তাদের প্রতি এরূপভাবে [উপলব্ধি করে] চলবে, সে ইহ-পরলোকের উত্তম বস্তুকে একত্রিত করবে। আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করে এ পর্যায়ে উপনিত করুন। এই কটি কথা আবু ইয়াজিদ বিস্তামী (রাহঃ) এর উক্তিটির উপর সামান্যতম স্পর্শের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি। [ইমাম নববী, বুস্তানুল আরিফীন (বৈরুত: দারুল কিতাবুল আরাবী, ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ৫৩-৫৪]

হযরত আবুল হাসান শাদিলী (রাহঃ) [মৃঃ ৬৫৬ হিঃ]

তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর একজন বড় মাপের অলিআল্লাহ। শাদিলী (রাহঃ) তাসাওউফ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন: যে কেউ আমাদের এই জ্ঞানের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে মৃত্যুবরণ করলো, সে না জেনেই তার গুরুতর গুণাহের উপর সনির্বন্ধ থেকে মারা গেলো। [ইবনে আযিবার, ইক্বাজুল হিমাম, পৃঃ ৮ থেকে উদ্ধৃত]

সুলতানুল উলামা ঈযজ ইবনে আব্দুস সালাম সুলামী (রাহঃ) [মৃঃ ৬৬০ হিঃ]

আব্দুস সালাম সুলামীর (রাহঃ) উপনাম হলো, সুলতানুল উলামা। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শায়খুল ইসলাম। হযরত আব্দুস সালাম শায়খ কাসিম ইবনে আলী দামেস্কী (রাহঃ) এর কাছে হাদীস শিক্ষা এবং ইলমে তাসাওউফের উপর হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রাহঃ) [৫৩৯-৬৩২ হিঃ] এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রাহঃ) ছিলেন সোহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সম্পর্কে হযরত জাহাবী (রাহঃ) বলেন, তিনি ছিলেন শায়খ, ইমাম, স্কলার, জাহিদ, জ্ঞানী, মুহাদ্দিস, শায়খুল ইসলাম, সুফিদের মধ্যে প্রথম স্তরের। [জাহাবী, সিয়ারুল আ-লমিন নুবালা]

হযরত আব্দুস সালাম প্রসিদ্ধ সুফি হযরত আবুল হাসান শাদিলীর (রাহঃ) নিকট থেকেও তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া শাদিলীর (রাহঃ) শিষ্য হযরত মুরসী (রাহঃ)-এর সুহবতে থেকেও ইলমে মা'আরিফাতের জ্ঞানার্জন করেন।

মিফতাহুস সাআদা গ্রন্থের লেখক আস-সুবকী তাঁর তাবাক্বাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুস সালাম বলেন, হযরত শাদিলী (রাহঃ) ও হযরত মুরসী (রাহঃ) এর জবান থেকে যখন উপদেশমূলক বাক্য বেরুতো, তা যেনো মনে হতো স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে উপদেশ শ্রবণ করে তা তাঁরা প্রকাশ করছেন। [মিফতাহুস সাআদা, ২, পৃঃ ৩৫৩; সুবকী, তাবাক্বাতাস শাফিয়্যা, ৮, পৃঃ ২১৪]

হযরত আব্দুস সালাম (রাহঃ) দু'খণ্ডে ক্বওয়াইদুল আহকাম ফি মাসাইলিল আনাম নামক তাঁর একটি গ্রন্থে সুফিদের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: তাঁরা আল্লাহর দল [কুরআন, ৫ঃ৫৬ এবং ৫৮ঃ২২]। তিনি তাসাওউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেন: হৃদয়ের উন্নতি, যার মাধ্যমে দেহ সুস্থ থাকে আর হৃদয় যদি হয় রোগা তাহলে দেহও রোগা। তিনি মনে করেন, বাহ্যিক শরীয়তের জ্ঞান হচ্ছে সাধারণ কিন্তু আভ্যন্তরীণ জ্ঞান হলো সূক্ষ্ম হাক্বিক্বাতের জ্ঞান। [আব্দুস সালাম সুলামী, ক্বওয়াইদুল আহকাম (দারুস শারক্ব লিল তিবাআ, ১৩৮৮/১৯৬৮) ১, পৃঃ ২৯; ২, পৃঃ ২১২]

তিনি তাসাওউফের উপর আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. শাযারাতুল মাআরিফাতিল আহওয়াল ওয়া সালিহাল আক্বওয়াল ওয়াল আমাল [মাআরিফাতের বৃক্ষ ও স্তরাবলী এবং সালেহীনের বক্তব্য ও আমাল]। বিশটি পরিচ্ছেদে রচিত এই বইয়ের শেষ সাতটিতে লেখক ইহসান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
২. মাসাইলুত তরীকা ফি ইলমিল হাক্বিক্বা [হাক্বিক্বাতের জ্ঞানের উপর প্রশ্নাবলী]। এই পুস্তকে ইলমে তাসাওউফের উপর ষাটটি প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
৩. রিসালা ফিল কুতুব ওয়াল আবদালিল আরবাঈন [কুতুব ও চল্লিশ আবদালের চিঠি]।
৪. ফওয়াঈদুল বালওয়া ওয়াল মিহান [কষ্ট ও পরীক্ষার ফলসমূহ]।
৫. নিহায়াতুর রুগবা ফি আদাবিস সুহবা [সাথীদের আদবের মধ্যে ইচ্ছার প্রাপ্তি]

হযরত আব্দুস সালাম (রাহঃ) সামা ও কবিতা আবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া জিকিরের আতিশয্যে সালিক যদি দেহকে নড়াচড়া করে তাতেও তাঁর কোন আপত্তি ছিলো না। এ ব্যাপারে একটি ফাতওয়া প্রদান করতে যেয়ে তিনি ইমাম আহমদ (রাহঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হাদীসটি এই:

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমি একদিন হযরত যাফর ইবনে আবি তালিব ও হযরত জায়িদ ইবনে হারিসা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ (রাঃ)-কে বললেন: তুমি আমার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি [আনতা মাওলায়া]। একথা শ্রবণ করে হযরত জায়িদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চতুর্দিকে একপায়ে লাফাতে লাগলেন [হাযালা]। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর [রাঃ]-কে বললেন: তোমার সৃষ্টি ও চরিত্র অনেকটা আমার মতো [আনতা আশবাহতা খালক্বি ওয়া খুলুক্বী]। একথা শ্রবণ করে জাফর (রাঃ) যায়িদের (রাঃ) পেছনে থেকে [খুশীতে] লাফালাফি শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর (আমাকে-অর্থাৎ আলী (রাঃ)-কে) বললেন, তুমি আমার প্রতি অধিকারভুক্ত এবং আমি তোমার প্রতি অধিকারভুক্ত [আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা]। এবার আমিও জাফরের (রাঃ) পেছনে থেকে লাফালাফি শুরু করলাম। [মুসনাদে আহমদ, ১, পৃঃ ১০৮]

শায়খুল হাদীস ইবনে হাজার আল-হাইছামী বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্কলার বলেছেন, সামা আবৃত্তির সঙ্গে রাক্বস বা নৃত্য করা বৈধ, এর মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। [আল-হাইছামী, ফাতওয়া হাদাসীয়্যা, পৃঃ ২১২] হযরত ঈয়াফী (রাহঃ) হাইছামী (রাহঃ)-এর সঙ্গে একমত। দু'জনই হযরত আব্দুস সালামের ফাতওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত সালাম স্বয়ং নিজেই সামা আবৃত্তি শ্রবণ করে প্রভাবিত অবস্থায় কিছুটা নৃত্য করেছেন [কানা ইয়াহদুরুস সামা ওয়া ইয়ারকুসু ওয়া ইয়াতাওয়াযাদু]। এ তথ্যটি হযরত ইবনে ঈমাদ (রাহঃ)- হযরত জাহাবী (রাহঃ), ইবনে শাকীর কুতাবী (রাহঃ), হযরত নাবাহানী (রাহঃ) এবং হযরত আবু সাআদাত (রাহঃ)-এর বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। [ইবনে ঈমাদ, শাজারাতায যাহাব ৫, পৃঃ ৩০২; ইবনে শাকির কুতাবী, ফাতওয়াল ওয়াফায়াত, ১, পৃঃ ৫৯৫; আল-ইয়াফিঈ, মিরআতুয যিনান, ৪, পৃঃ ১৫৪, ইমাম নববী, জামি কারামাতিল আউলিয়া, ২, পৃঃ ৭১; আবু সাআদাত, তাজুল মাআরিফ, পৃঃ ২৫০]

তবে সামা ও নৃত্য কিন্তু সকল ক্ষেত্রে জায়িয নয়। ইমাম ও মুহাদ্দিসরা বলেছেন, একমাত্র বিশেষ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সাধকদের পক্ষেই তা করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর সামার সঙ্গে কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ। ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) অবশ্য এই ফাতওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। আব্দুস সালাম তাঁর এই প্রখ্যাত ফাতওয়ায় পরিষ্কার করে বলেছেন কোন ধরনের সামা বৈধ:

নৃত্য করা একটি বিদআত যা কোন মতেই জায়িয নয় একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে পাগল বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কবিতা আবৃত্তির [সামার] ব্যাপারে কথা হলো, যদি তা কাউকে পবিত্রতার দিকে নিয়ে যায় [আহওয়াস সানিয়্যা] এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করে দেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই, বরং তা অনাসক্ত হৃদয়ের জন্য উৎসাহিত করার যোগ্য। কিন্তু কেউ যদি এ থেকে নাফসানী খাহিশাত [বাতিল ইচ্ছা] হাসিল করতে চায়, কারণ সামা হৃদয়ের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাকে, তাকে উজ্জীবিত করে তুলে, তাহলে অবশ্যই তার জন্য সামার আসরে যোগদান অবৈধ। [আব্দুস সালাম সুলামী, ফাতওয়া মিসরিয়্যা, পৃঃ ১৫৮]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নাফসানী খাহিশাত থেকে মুক্ত হয়ে সামায় অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভব নয়। সুতরাং সামা শুধুমাত্র উচ্চ পর্যায়ের আরিফদের ক্ষেত্রে বৈধ।

হযরত আব্দুস সালাম (রাহঃ) তাঁর ক্বাওয়াইদুল আহকাম কিতাবে বলেন: নৃত্য ও হাততালি একটি খারাপ কাজ, এগুলো যারা করে তারা অজ্ঞ। আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব প্রকাশে এরূপ কাজ নিন্দনীয়। সত্যিকার জ্ঞানবান লোক তা করতে পারে না। কারণ, শরীয়তের মধ্যে এর কোন প্রমাণ নাই। কুরআন-সুন্নাহ এবং কোনো নবী-রাসূল বা তাঁদের সাহাবীরা হাততালি ও নৃত্য করে আল্লাহর গুণগান করেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই। [আব্দুস সালাম সুলামী, ক্বওয়াইদুল আহকাম, ২, পৃঃ ২২০-২২১]

হযরত আব্দুস সালাম (রাহঃ) আউলিয়া ও উলামাদের মধ্যে স্তরভেদের উপর একটি ফাতওয়া দিয়েছিলেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, ইমাম গায্যালী (রাহঃ) ও হযরত কুশায়িরী (রাহঃ) মনে করেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা হচ্ছেন আউলিয়া এরপর আসে উলামার স্তর। আপনি কি মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন: আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী এবং আল্লাহর আইন সম্পর্কে জ্ঞানীদের মধ্যে কে বেশী মর্যাদাশীল, এ প্রশ্নের দিক থেকে ইমাম গায্যালীর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। আল্লাহর শরীয়তের জ্ঞান থেকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান যে উত্তম তা কেউই সন্দেহ করে না। তবে শুধু তাই নয়, আল্লাহর আইনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও দ্বীনের উপর অন্যান্য জ্ঞানবানদের তুলনায়ও আল্লাহকে যে জানে সে বেশী মর্যাদাশীল। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশীল। বেশীরভাগ স্কলারদের অধিকাংশ সময় আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী [যাত ও সিফাত] সম্পর্কে জ্ঞানার্জন পর্দার

আড়ালেই কেটে যায়। অন্যথায় তারা সুফিদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়ে যেতেন এবং অনেকে হয়েছেনও। এবং [দ্বীনের] আইনজ্ঞ ও সাধকরা কিভাবে একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন যখন আল্লাহ পাক বলেছেন: আল্লাহর দৃষ্টিতে সে-ই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল যে তাক্বওয়াহ অবলম্বনকারী [পরহেজগার, জিকিরকারী] [৪৯ঃ১৩]। তিনি আরও বলেছেন: তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই [জ্ঞাতরাই] তাঁকে বেশী ভয় করে [৩৫ঃ২৮]। এখানে উলামা বলতে তাঁকে যারা জানে [তাঁর যাত, সিফাত, কার্যাবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান] তাদের কথাই উদ্দেশ্য, ওদের কথা নয় যারা তাঁর আইন সম্পর্কে জ্ঞানবান। আউলিয়ারা যে উলামাদের থেকেও মর্যাদাবান তার অপর একটি প্রমাণ হলো, আওলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহ পক কারামত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর আইন সম্পর্কে জ্ঞানবানদের ক্ষেত্রে তা কোন সময়ই ঘটে না, যদি না তারা সুফিদের রাস্তায় প্রবেশ করে [কারামত প্রকাশের জন্য] উপযুক্ত যোগ্যতা হাসিল করতে পারেন। [আব্দুস সালাম সুলামী, ফাতওয়া, সং, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ফাত্তাহ (বৈরুত: দারুল মাআরিফা, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ১৩৮-১৪২]

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুস সালাম (রাহঃ) মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে উপরোক্ত ফাতওয়ায় কিছুই বলেন নি। এর কারণ হলো, তাদেরকে সাধারণত ফিকহ শাস্ত্রে স্কলারদের নীচের স্তরের স্কলার মনে করা হয়। ইবনে আবি জায়িদ মালিকী (রাহঃ) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইয়না (রাহঃ) বলেছেন: ফিকহ ছাড়া হাদীস [মানুষকে] দিগভ্রান্ত করে। এবং ইমাম মালিকের সাথী ইবনে ওয়াহব (রাহঃ) বলেন: কোন হাদীস বিশারদের যদি ফিকহের ইমাম না থাকেন তবে তিনি দিগভ্রান্ত। আল্লাহ যদি আমাদেরকে মালিক (রাহঃ) ও লায়িত (রাহঃ) দ্বারা রক্ষা না করতেন, তাহলে আমরা ভ্রান্ত হয়ে যেতাম। [ইবনে আবু যায়িদ, জামি ফিল-সুনান, পৃঃ ১১৮-১১৯]

আমরা ইতোমধ্যে ইমাম মালিক (রাহঃ) এর হুঁশিয়ারীর কথা উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলেছেন, ধর্ম অনেকগুলো হাদীস বর্ণনার মধ্যে নিহিত নয়, তার মূলে আছে নূর যা হৃদয়ে পতিত হয়ে স্থায়ী হয়।

ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) [৬৬১ -৭২৮ হিজরী]

ইবনে তাইমিয়্যার অনুসারী বলে দাবীদাররা প্রচার করে থাকে যে, হাম্বলী মাযহাবের এই মুহাদ্দিস সুফিদের বিরোধী ছিলেন। তাঁকে তারা একটি মুভমেন্টের ইমাম ভাবে এবং তাঁর নাম নিয়ে বর্তমানে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত তাসাওউফ বিরোধী কট্টরতার অবতারণা করেছে, যা সার্বিকভাবে উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু বাস্তবে ইবনে

তাইমিয়্যা স্বয়ং নিজেই একজন সুফি ছিলেন। তবে উক্ত তথাকথিত 'পূর্বসুরীদের' অনুসারী বলে দাবীদার দলটি ইবনে তাইমিয়্যার 'সুফি' পরিচিতি যাতে তুলে ধরা হয় না এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। কারণ, এর মাধ্যমে সুফি বিরোধী তাদের যাবতীয় বাদ-মতবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই প্রমাণ করবো যে, ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) কিছু কিছু সুফিদের সমালোচক ছিলেন বটে কিন্তু সার্বিকভাবে তিনি তাসাওউফের বিরোধী ছিলেন না, বরং তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে বিরাট ফায়িদা লাভ করেছিলেন।

ইবনে তাইমিয়্যা কাদিরীয়া তরীকার একজন সুফি ছিলেন। আমরা এখন এর প্রমাণ উপস্থাপন করবো। তবে এটা জেনে নেয়া উচিত যে, ইবনে তাইমিয়্যা সুফি ছিলেন কি না তার উপর ভিত্তি করে সুফি তরীকা বা ইলমে তাসাওউফের প্রমাণ বা প্রমাণ নয়, এমন চিন্তার কোন অবকাশ নেই। কারণ, তাঁকে সাধারণত সুফিতত্ত্বের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করা হয় না। তবে এখানে সুফিদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা ইলমে তাসাওউফের ক্ষেত্রে তাঁর কিরূপ আক্বীদা ছিলো তা তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ, অনেকেই তাঁর এসব চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। অনেক তথাকথিত অরিয়েন্টালিষ্ট [প্রাচ্যবিদ] এবং সলফে-সালিহীনের অনুসারী হওয়ার দাবীদার লেখকরা কিভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় অপব্যাখ্যা করেছেন তা এই লেখা থেকে স্পষ্ট হবে। তিনি যে তাসাওউফের দুশমন ছিলেন না সেটা প্রমাণ করার জন্যই আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

আগেই বলেছি, ইবনে তাইমিয়্যা কাদিরীয়া তরীকার খেলাফতপ্রাপ্ত সুফি ছিলেন। তিনি তরীকতের শায়খ হিসেবে খিরকা [জুব্বা] পরিধান করতেন। তিনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানীকে (রাহঃ) 'আমার শায়খ' এবং 'আমার নেতা' বলে সম্বোধন করতেন। ইবনে তাইমিয়্যা বড়পীর সাহেবের ফুতুহুল গায়েব গ্রন্থের একটি শরাহও লিখেছিলেন। এই ১০০ পৃষ্ঠার পুস্তকে তিনটি মাত্র বক্তৃতার ব্যাখ্যা করেন। তিনি ধারণা করতেন মুসলিম উম্মাহর জন্য তাসাওউফ জরুরী ছিলো। [এই বক্তব্য ইবনে তাইমিয়্যার মাযমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা প্রথম রিয়াদ সংস্করণের, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫-৫৪৮ -তে লিপিবদ্ধ আছে।]

উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, শরীয়তের মূল ভিত্তির উপরই ইলমে তাসাওউফ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই মতকে প্রমাণ করতে যেয়ে তিনি আগেকার যুগের প্রখ্যাত অনেক সুফি-দরবেশসহ সমসাময়িক অনেক তাসাওউফপন্থীদের নাম উল্লেখ

করেন। তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেন তাদের মধ্যে [সমসাময়িক] হাম্বলী মাযহাবপন্থী হযরত আনসারী হারাওয়ী, হযরত হাম্মাদ দাব্বাস; [আগের যুগের] হযরত ফুজায়িল ইবনে আয়াজ, হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, হযরত মারুফ কারখী, হযরত সিররী সাক্বতী, হযরত জুনায়িদ ইবনে মুহাম্মদ, শায়খ হাম্মাদ, শায়খ আবুল বায়ান (রাহঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। [মাযমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা, ১০, পৃঃ ৫১৬]

ইবনে তাইমিয়্যা তাঁর রিসালাতুস সাফাদিয়্যা গ্রন্থে সুফিদেরকে সমর্থন করে বলেন, হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলাইমি তাঁর তাবাক্বাতুস সুফিয়্যা এবং হযরত আবুল কাসিম কুশায়রী তার রিসালা গ্রন্থে যেসব মহান শায়খদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ছিলেন আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং আহলে-হাদীসের অনুসারী। যেমন ফুজায়িল ইবনে আয়াজ, জুনায়িদ ইবনে মুহাম্মদ, সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী, আমর ইবনে উসমান মক্কী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাফিফ সিরাজী (রাহঃ) এবং অন্যান্যরা। তাঁদের বক্তব্য ছিলো সুন্নাহ মুতাবিক এবং তাঁরা সুন্নাহর উপর বই-পুস্তক রচনা করে গেছেন। [ইবনে তাইমিয়্যা, আস-সাফাদিয়্যা, রিয়াদঃ মাযহাবী হানাফী, ১৩৯৬/১৯৭৪, ১, পৃঃ ২৬৭]

ইবাদত ও বিদআতের উপর তাঁর রচিত রিসালাতাল ইবাদাতুশ শরীয়াহ ওয়াল-ফারক্ব বাইনাহা ওয়া বাইনাল বিদঈয়্যা গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়্যা স্পষ্ট ভাষায় লিখেনঃ শরীয়তের আইনসঙ্গত রাস্তা হচ্ছে সেটি যা হলো সুফিদের পথ বা জুহদের রাস্তা এবং সেটি যা হলো তাসাওউফ ও দীনতা। অর্থাৎ ফুক্বারা ও সুফিদের রাস্তা। আইনসঙ্গত সে পথ, যে পথে কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে। এটা হক্ব রাস্তা, আনুগত্য, ভালো আমল, দানশীলতা এবং সঠিক। এটাই সালিকীনের [সুফিদের] রাস্তা জুহুদ (আত্ম-সংগ্রাম) এবং ধর্মীয় ইবাদতকেই বলে দীনতা ও তাসাওউফ। [ইবনে তাইমিয়্যা, মাযমুআতুর রাসাঈল ওয়াল মাসাঈল, বৈরুত, লানযাতুত্ ত্যুরাসিল আরাবী, ৫, পৃঃ ৮৩]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে ইবনে তাইমিয়্যা প্রথমেই বলেন, তাঁর শিক্ষা হচ্ছে, সালিককে (সুফি রাস্তার পথিককে) তিনি দুনিয়াবী খাহেশাত থেকে দূরে থাকার কথা বলেন যা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে নয়, কারণ এসব খাহেশাতের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে ক্ষতিকর জিনিস। তবে খাহেশাত কতটুকু পর্যন্ত বর্জন করতে হবে? ইবনে তাইমিয়্যা স্বীকার করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে প্রতিটি অবস্থার পুরো দিক-নির্দেশনা দেয় না। কোন কোন সময়

মানুষ এমন কিছু সমস্যা বা অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে যার সঠিক সমাধান শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহ থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, ইজতিহাদী ফায়সালাকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা দরকার। বিশেষ করে ইলহামের ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী। তিনি বলেন: ইলহাম হচ্ছে সত্যের ইঙ্গিত। ক্ষেত্রবিশেষে ইলহামী জ্ঞান দুর্বল হাদীস ও দুর্বল যুক্তি থেকেও উত্তম হতে পারে। [মাযমুআতু ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা, ১০, পৃঃ ৪৭৩-৪৭৪]

তিনি ইশকে ইলাহীর গুরুত্বকে সমর্থন জানিয়ে একটি পুস্তকে লিখেন: সুফিদের ব্যাপার হলো, তাঁরা (আল্লাহর) আশিক এবং এ ব্যাপারটি অন্যান্য সব বিষয় থেকে প্রবল। তাঁদের রাস্তার মূলই হচ্ছে ইচ্ছা ও প্রেম। আল্লাহ প্রেমের স্বীকৃতি আগেকার দিনের সুফি ও বর্তমানের সুফিদের মধ্যে বিদ্যমান। এ স্বীকৃতি কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের মধ্যেও বিদ্যমান। [ইবনে তাইমিয়্যা, আল-ইহতিতায বিদাল ক্বাদার, কায়রো: আল-মাতবাউস সালাফিয়্যা, ১৩৯৪/১৯৭৪, পৃঃ ৩৮]

ইবনে তাইমিয়্যা অবশ্য ইবনে আরাবীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে তিনি সরাসরি ইবনে আরাবীর নিন্দা করেন নি বরং তাঁর লিখিত ফুসুলুল হিকাম নামক একটি ছোট্ট বইয়ের প্রতিবাদ জানান। কিন্তু ইবনে আরাবী ছিলেন প্রখ্যাত গ্রন্থ ফুতুহুল মাক্কিয়্যা [মক্কার বক্তব্যসমূহ] এর লেখক। এই গ্রন্থের উপর ইবনে তাইমিয়্যাও ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন: অতীতে যারা ইবনে আরাবীর গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হয়েছেন আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। যেমন ফুতুহাতুল কুনহ, মুকামুল মারবুত, দুররুল ফাকিরা, মাতালিউন-নুযুম ইত্যাদি গ্রন্থাবলী। [ইবনে তাইমিয়্যা, তাওহিদুর রুবুবিয়্যা, মাযমুউল ফাতওয়াল কুবরা, রিয়াদ: ১৩৮১, ২, পৃঃ ৪৬৪-৪৬৫]

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলেন, আমি তাঁর (ইবনে আরাবী) সম্পর্কে আমার মতামত একমাত্র ফুসুলুল হিকাম এর কারণে পরিবর্তন করেছি।

আমরা শুরুতে বলেছি, ইবনে তাইমিয়্যা ছিলেন কাদিরীয়া সুফি তরীকার অনুসারী। এবার এ কথার প্রমাণ উপস্থাপন করছি।

তাঁর ছাত্র ইবনে আব্দুল হাদী [মৃঃ ৯০৯ হিজরী] বলেন, তিনজন শায়খের সিলসিলা মুতাবিক তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর তরীকার খিরকা লাভ করেন। এ প্রমাণটি ১৯৭০ সালের দিকে প্রকাশিত কয়েকটি লেখায় জর্জ মাক্বদিসি প্রকাশ করেন।

[জর্জ মাক্বদিসি, লাইসনাদ ইনিটিয়াটিক সুফি ডি মুয়াফফাক্ব উদ্দীন ইবনে কুদামা; চার্লস ডি ইহার্ন: লুইস মেসিনন (প্যারিস: সংস্করণ ডি ইহার্ন, ১৯৭০) পৃঃ ৮৮-৯৬; ইবনে তাইমিয়্যা: একজন কাদিরিয়া তরীকার সুফি; আমেরিকান জার্নাল অফ আরাবিক ষ্ট্যাডিজ ১ (লেইডেন: ই জে ব্রিল, ১৯৭৪) পৃঃ ১১৮-১২৯; দ্যা হাম্বলী স্কুল এন্ড সুফিজম; বুলেটিন ডি লা এসোসিয়েশন ইন্টানোলা ডি অরিয়েন্টিলিসটাস ১৫ (মাদরিদ, ১৯৭৯) পৃঃ ১১৫-১২৬]

ইউসুফ ইবনে আব্দুল হাদী হাম্বলী রচিত বাদাল ঈলক্বা বি লাবসিল খিরক্বা নামক একটি পাণ্ডুলিপিতে ইবনে তাইমিয়্যার নাম লিপিবদ্ধ আছে। সুফি সিলসিলার এই তালিকায় হাম্বলী মাযহাবের আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ উলামার নাম আছে। এখানে সেই সিলসিলাটি লিপিবদ্ধ করা হলো:

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ) [মৃঃ ৫৬১ হিঃ]
শায়খ আবু উমর ইবনে কুদামা (রাহঃ) [মৃঃ ৬০৭ হিঃ]
শায়খ মুয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা (রাহঃ) [মৃঃ ৬২০ হিঃ]
শায়খ ইবনে আবু উমর ইবনে কুদামা (রাহঃ) [মৃঃ ৬৮২ হিঃ]
শায়খ ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) [মৃঃ ৭২৮ হিঃ]
শায়খ ইবনে কাইয়ূম যাওজি (রাহঃ) [মৃঃ ৭৫১ হিঃ]
শায়খ ইবনে রাযাব (রাহঃ) [মৃঃ ৭৯৫ হিঃ]।

এখানে উল্লেখ্য যে, আবু উমর ইবনে কুদামা ও তাঁর আপন ভাই মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা উভয়েই তরীকতের খিলাফত লাভ করেন সরাসরি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর কাছ থেকে।

ইবনে আব্দুল হাদী আরও বলেন, ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন: আমি কয়েকজন ভিন্ন তরীকার শায়খের নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেছি [সুফি খিরকা পরিধান করেছি]। এদের মধ্যে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর তরীকা যা হলো জানা তরীকাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এছাড়াও ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন: সর্বোত্তম সুফি তরীকা [আফদ্বালুত-তুরুক্ব] হচ্ছে আমার সর্দার (সায়্যিদী) হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর তরীকা। [ইবনে আব্দুল হাদী, বাদাল ঈলক্বা বি লাবসিল খিরক্বা, এমএস আল-হাদী, প্রিন্সটন লাইব্রেরী আরাবিক কালেকশন, ফলস, ১৫৪এ, ১৯৬বি, ১৭১বি, ১৭২এ; এবং দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, মূল আরবী পাণ্ডুলিপির কপি, ৯৮৫এইচ]

তিনি অন্য একটি পুস্তকে বলেন: লাবিসতুল খিরক্বাতাল মুবারাকাতা লিশ শায়খ আব্দুল কাদির ওয়া বাইনা ওয়া বাইনাহু শাইখানে [আমি আব্দুল কাদির জিলানীর মুবারক সুফি খিরক্বা পরিধান করেছি, তাঁর ও আমার মধ্যে ছিলেন দু'জন শায়খ]। [পাণ্ডুলিপি দামেস্ক, জাহিরিয়্যা ১১৮৬এইচ]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে ইবনে তাইমিয়্যা যে একজন সুফি ছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার দেখা যাক সুফিদের ও তাসাওউফের ব্যাপারে তিনি কী বলেছিলেন?

তাঁর মাযমুয়া ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা আল-কুবরা গ্রন্থের ১১তম খণ্ডে [তাসাওউফ খণ্ডে] সুফিয়্যা ওয়াল ফুক্বারা শিরোনামে একটি প্রবন্ধ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এতে তিনি বলেন: প্রথম তিন শতাব্দির মধ্যে সুফি শব্দটি সবার জানা ছিলো না। তবে এর পরে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। একাধিক ইমাম ও শায়খ এব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু সুলাইম আদ-দারানী এবং অন্যান্য। কথিত আছে সূফিয়ান আস-সওরী এটা (সুফি শব্দ) ব্যবহার করেছেন। অন্যরা বলেছেন, হাসান বসরীও তা ব্যবহার করেছেন। [ইবনে তাইমিয়্যা, মাযমুয়াল ফাতওয়াল কুবরা, ১১, পৃঃ ৫]

এরপর ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, তাসাওউফ তাবিঈনদের যুগ পরে বসরায় আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, তার মতে প্রাথমিক যুগের অনেক সুফিই এই শহরে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তিনি অন্যত্র কোন সুফিদের সন্ধান পান নি। এ মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি ভুলবশত তাসাওউফকে একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করেছেন এবং এর যোগসূত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের থেকে কর্তিত করে ফেলেছেন। আর এ কারণেই আজকের আধুনিকতাবাদীরা কুরআন ও সুন্নাহতে তাসাওউফ কোন্ জায়গায় বলা হয়েছে? এরূপ প্রশ্ন করে বসে। ইবনে আযিবা এর জবাবে বলেন: তাসাওউফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁকে আল্লাহ পাক অহি ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। [ইবনে আযিবা, ইক্বাজুল হিমাম, পৃঃ ৬]

উক্ত প্রবন্ধে ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলেন: তাসাওউফে আছে সত্যাপোলব্ধি [হাক্বাইক্ব] এবং অনুভূতির স্তর [আহওয়াল]। সুফিরা তাঁদের বক্তব্যে তা প্রকাশ করেন।

কেউ কেউ বলেন, সুফি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি গ্বাইরুল্লাহ থেকে নিজেকে পবিত্র করেন ও আল্লাহর জিকিরে নিজেকে বিলীন করে দেন এবং তিনি আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হন এ পর্যায়ে যে, তাঁর কাছে [দুনিয়ার] স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। অন্যরা বলেন, তাসাওউফ হচ্ছে মহামূল্যবান বাস্তবতাকে রক্ষা করা এবং যশ-খ্যাতিকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি। সুতরাং সুফির অর্থ হচ্ছে সিদ্দীক বা যে সম্পূর্ণরূপে হাক্বিকাতের স্তরে উন্নীত হয়েছেন। কারণ, মানুষের মধ্যে নবীদের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন সিদ্দীকীন, যেমন আল্লাহ একটি আয়াতে বলেন: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে তারা ঐসব লোকদের দলে আছে যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়: তাঁরা নবী, সত্যবাদী (সিদ্দিকীন), শহীদ এবং সৎকর্মশীল; আহ, কী উত্তম দল! [৪ঃ৬৯]।

আরও কিছু বক্তব্যের পর ইবনে তাইমিয়্যা সুফি এবং আলিমদেরকে দুটি আলাদা দলে বিভক্ত করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সকল বড় বড় শায়খরা সকলেই আলিম ছিলেন। জুনায়িদ বাগদাদী এই আলাদাকরণের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন তাই একটি প্রখ্যাত বক্তব্যে তিনি বলেন: আমাদের এই জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তিশীল। ইবনে তাইমিয়্যার তাবাক্বাতুল কুবরায় প্রকাশিত এই মারাত্মক ভুলের জবাবে শারানী হযরত জুনায়িদ বাগদাদীর উপরোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেনঃ প্রত্যেক আসল সুফি হচ্ছেন পবিত্র আইনের [শরীয়তের] পণ্ডিত, তবে এর বিপরীত কথা সঠিক না-ও হতে পারে [অর্থাৎ প্রত্যেক পণ্ডিত সুফি না-ও হতে পারেন]। [আল-শারানী, তাবাক্বাতাল কুবরা, ১, পৃঃ ৪]

ইবনে তাইমিয়্যার মতে একদল সুফি আছেন যারা নৈকট্যশীল এবং অপর একদল আছেন যারা বিদআতী ও মুক্তচিন্তাবিদ [জিন্দিক]। শেষোক্ত দলের লোকেরাও সুফি হওয়ার দাবী করে অথচ আসল সুফিরা এদেরকে সুফি হিসেবে মেনে নেন নি। যেমন, মনসুর হাল্লাজ [ইবনে তাইমিয়্যা এখানেই ভুলটি করেছেন। অনেকে বলেন, তাসাওউফের উপর তাঁর সীমিত জ্ঞান থাকায়ই তিনি মনসুর হাল্লাজকে জিন্দিক মনে করেছেন। এর কারণ হলো, আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে বলেছেন: সুফিদের মধ্যে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার নয়, কিন্তু ইবনে আতাউল্লাহ, ইবনে খাফিফ এবং আবুল কাসিম নাসিরাবাদীর মতো প্রখ্যাত সুফিরা তাঁকে অলিআল্লাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। [আবদুল ক্বাহির আল-বাগদাদী, উসূলদ-দ্বীন, পৃঃ ৩১৫-৩১৬] এছাড়া ইবনে তাইমিয়্যার মাযহাবের প্রখ্যাত ক'জন আলিমও হাল্লাজ (রাহঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁকে একজন অলিআল্লাহ হিসেবে

স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইবনে আক্বিল এবং ইবনে কুদামা (রাহঃ)।]

ইবনে তাইমিয়্যা আরো বলেন: তাসাওউফ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং তিন ধরনের সুফিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে:

১. সুফিয়াতুল হাক্বাইক্ব: হাক্বিকাতের সুফিরা এবং এদের কথাই আমরা উপরে বর্ণনা করেছি;

২. সুফিয়াতুল আরজাক্ব: এরা হচ্ছে দানের উপর ভিত্তিশীল সুফি। এরা সুফিদের খানকাহ্ ও ধর্মীয় মুসাফিরখানায় পড়ে থাকে; এরা হক্বিক্বাতপন্থী না-ও হতে পারে।

৩. সুফিয়াতুর রুসুম: বাহ্যিক সুফি। এরা সুফি নাম ও পরিধানের উপর লালায়িত। [ইবনে তাইমিয়্যা, মাযমুআল ফাতওয়াল কুবরা, ১১, পৃঃ ১৬-২০]

ফানার [আত্মবিলুপ্তি] ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়্যা বলেন: প্রেমের এই স্তর অনেক প্রেমিক ও আল্লাহপ্রাপ্তির আগ্রহীদের (আহলুল ইরাদা) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের অতিশয্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে শুধু আল্লাহর কথাই স্মরণ করে নিজেকে স্মরণ করে না। নিজেকে ভুলে আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহকে সাক্ষী হিসেবে নেয়, নিজেকে সাক্ষী হিসেবে নেয় না, আল্লাহর মধ্যে স্তিত হয়, নিজের মধ্যে নয়। যখন সে এই স্তরে উপনিত হয় তখন সে তার নিজের অস্তিত্ব আর অনুভব করে না। এ অবস্থায় সে হয়তো বলতে পারে, আনাল হাক্ব (আমিই সত্য- মনসুর হাল্লাজ), বা সুবাহানী [প্রশংসা আমার প্রতি- বায়েজিদ বিস্তামী], কিংবা মাফিল জুব্বা ইল্লাল্লাহ [এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই]। এসব কথা সে বলে এই কারণে যে, সে আল্লাহর প্রেমে সম্পূর্ণরূপে মত্ত হয়েছে এবং এটা এমন একটি সুখ-আনন্দময় অবস্থা যে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ যে, এই বিষয়ের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা জড়িত। অথচ কেউ যখন তাঁর (আল্লাহর) অনুগ্রহে আল্লাহর ইশকের মধ্যে ডুবে যায় তখন সে তার খিয়ালকে হারিয়ে ফেলে, এবং এই বেহুঁশ অবস্থায় সে নিজেকে দেখতে পায় আল্লাহর মধ্যে বিলীন [ইত্তিহাদ]। আমি এটাকে গুণাহ মনে করি না, কারণ এই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না কারণ, সে যা করছে বা বলছে এ ব্যাপারে সে নিজেই ওয়াকিফহাল নয়। কলম কোন পাগলকে নিন্দা করে না তবে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন ভিন্ন কথা [যদি তখনও একই কার্য করে]। সুতরাং যখন সে ঐ অবস্থায় উপনিত হয় তখন সে আল্লাহর এই বাক্যের আওতায় চলে আসে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করে বসি তবে আমাদের

পাকড়াও করো না [২ঃ২৮৬]। আপনি যদি অজ্ঞতাবশত নিয়ত ছাড়াই ভুল করে বসেন তাহলে আপনার কোন দোষ নেই। [উপরোদ্ধৃত, ২, পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭]

একটি ঘটনার কথা বলা যায়। দু'ব্যক্তির মধ্যে একে অন্যের প্রতি এতো বেশী মহব্বত ছিলো যে, একদা একজন সমুদ্রে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে অপরজনও লাফ মেরে দরিয়ায় পড়ে গেল। তখন প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, আমি তো দুর্ঘটনাবশত [অর্থাৎ অনিচ্ছায়] সাগরে পতিত হয়েছি, তুমি কেন স্বেচ্ছায় লাফ মারলে? দ্বিতীয়জন উত্তরে বললো, আমি তো আপনার মাঝে বিলীন হয়েছি এবং নিজেকে আর দেখছি না। আমি মনে করেছি আপনি আমি এবং আমি আপনি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো নিষিদ্ধ বস্তু সেবন করে মাতাল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কার্যাবলী গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সে যদি কোনো নিষিদ্ধ বস্তু দ্বারা (অর্থাৎ তার ইচ্ছা যদি খারাপ হয়) মাতাল হয়ে থাকে তবে তাকে ক্ষমা করা যায় না। [উপরোদ্ধৃত, ১০, পৃঃ ৩৩৯]

ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী (রাহঃ) [মৃত ঃ ৭০৯ হিজরী]

প্রখ্যাত সূফী দরবেশ আবুল ফজল ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী শুধুমাত্র সূফী শায়েখ ছিলেন না, তিনি সে যুগের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, ওয়াইজ এবং মালিকী মাযহাবের স্কলার ছিলেন। তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। এগুলো হচ্ছে আল-হিকাম, মিফতাহুল ফালাহ আল-ফুদ্দুসুল মুজাররাদ ফী মা'আরিফাতিল ইসমিল মুফরাদ, তাজুল আরুসিল হাবী লী তাহদিবিন নুফুস, উনওয়ানুত তাওফিক্ব ফী আদাবিত তারিক্ব, আল-লাতাইফ ফী আবিল আব্বাসিল মুরসি ওয়া শায়খিহী আবিল হাসান। তিনি আবুল হাসান মিসরী [মৃত ঃ ৬৬৮ হিঃ] (রাহঃ) -এর তরীকতের শিষ্য ছিলেন।

ইবনে আতাউল্লাহ (রাহঃ) হচ্ছেন ইবনে তাইমিয়্যার (রাহঃ) কয়েকজন প্রসিদ্ধ সমালোচকদের একজন। তবে তিনি সম্মানের খাতিরে কখনও কোন লেখালেখিতে ইবনে তাইমিয়্যার (রাহঃ) নাম সরাসরি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর লাতাইফ গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ সুফিদেরকে তথাকথিত জাহিরী স্কলারদের প্রচারের সম্মুখে পরীক্ষায় পতিত করেছেন। [ইবনে আতাউল্লাহ, লাতাইফুম্মিনান ফী মানাক্বিবিল আব্বাস, কায়রো ১৩৫৭ হিঃ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭-১৮] অবশ্য জাহিরী আলিমদের রোষানল থেকে কোন যুগেই সুফিরা মুক্তি পান নি। সুফিদের রাস্তা যারা বুঝেন না তাঁরা সর্বদাই সুফি তরীকা সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে আসছেন। এ অবস্থা আজো বিদ্যমান। যা হোক, আমরা পাঠকদের সম্মুখে সম্ভবত এই প্রথম বাংলা

ভাষায় ইবনে তাইমিয়্যা ও ইবনে আতাউল্লাহর (রাহঃ) মধ্যকার ঐতিহাসিক সংলাপের অনুবাদ প্রকাশ করলাম। এই অনুবাদটি একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে। মূল ইংরেজী অনুবাদটি করেছেন বর্তমান যুগের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার প্রখ্যাত শাখয় মুহাম্মদ হিশাম কাব্বানি। অনুবাদটি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'সালাফী বিদআতের অস্বীকৃতি' - (কাজি, ১৯৯৬) পৃঃ ৩৬৭-৩৭৯ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উসূলুল উসূলবী মুহাম্মদ জাকী ইব্রাহীম ইবনে কাছির, ইবনে আতীর এবং অন্যান্য জীবনী সংক্রান্ত অভিধান প্রণেতা ও জীবনী লেখকদের কাছ থেকে আমাদের কাছে এই ঐতিহাসিক সংলাপের সহীহ বর্ণনা এসেছে। [ইবনুল ইমাদ, শাজারাতুয যাহাব [১৩৫০ হিঃ], খঃ ৬, পৃঃ ২০ (টীকা); আল-যিরিকলী, আল-আলাম [১৪০৫ হিঃ], খণ্ডঃ ১, পৃঃ ২২১; ইবনে হাজার, দুরাল কামিয়া [১৩৪৮ হিঃ], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-২৭৩; ইবনে কাছির, বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া [১৩৫১ হিঃ সং], খণ্ডঃ ১৪, পৃঃ ৪৫; সুবকি, তাবাক্বাতুস সাফিয়্যা [১৩২৪ হিঃ সং], খণ্ডঃ ৫, পৃঃ ১৭৭ (টীকা) এবং খণ্ড ৯, পৃঃ ২৩ (টীকা); জালালুদ্দিন সুয়ুতী, হুসনুল মুহাদারা ফী আখবারি মিশরী ওয়াল ক্বাহিরা [১২৯৯ হিঃ সং], খণ্ডঃ ১, পৃঃ ৩০১; শারানী, তাবাক্বাতুল কুবরা [১৩৫৫ হিঃ সং], খণ্ডঃ ২, পৃঃ ১৯ (টীকা) ইত্যাদি প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

মহাত্মন আলিমদের মধ্যকার সংলাপ বা বাহাসের রূপ সম্পর্কে এটা থেকে অনেক ধারণা আমরা করতে পারি। ইলমে তাসাওউফ শাস্ত্রের উপর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী (রাহঃ) ও তথাকথিত সালাফী মুভমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব [বর্তমান সালাফীদের দাবী অনুযায়ী] হযরত শায়খ আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ)-এর মধ্যকার মতানৈক্য এই ডক্যুমেন্টে রেকর্ড হয়ে আছে। এই বাহাস সংঘটিত হয় মিশরে। তখন মিশরের মামলুকী শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ ইবনে কালাওয়ান (আল-মালিক আন-নাসির)।

ইবনে আতাউল্লাহ ও ইবনে তাইমিয়্যার মধ্যকার সংলাপ

এসময় শায়খ ইবনে তাইমিয়্যা আলেকজান্দ্রিয়ার জেলে বন্দী ছিলেন। এরপর সুলতান তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার পর কায়রো চলে আসেন। মাগরিব নামাযের ওয়াক্তে তিনি আল-আযহার মসজিদে আসলেন, তখন ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন শায়খ ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী। নামায শেষে ইবনে তাইমিয়্যাকে মুক্তাদী হিসেবে তাঁর পেছনে

নামায আদায় করেছেন দেখে তিনি অবাক হলেন। তিনি তাঁকে কায়রোতে আগমনে খুশী হয়ে সহাস্যে স্বাগত জানিয়ে সালাম জানালেন, আসসালামু আলাইকুম। এরপর ইবনে আতাউল্লাহ এই আলীমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হলেন।

ইবনে আতাউল্লাহঃ সাধারণত আমি মাগরিবের নামায ইমাম হুসাইন (রাঃ) মসজিদে পড়ে থাকি এবং ইশার নামায এখানে আদায় করি। কিন্তু দেখুন, আল্লাহর ইচ্ছা কিভাবে কাজ করে! আপনাকে স্বাগত জানাতে আল্লাহ প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমাকেই মনোনীত করলেন (কায়রোতে আপনার আগমনের পর)। বলুন, ওহে ফকীহ, যা হয়েছে তার জন্য কি আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ আমি জানি, আপনি কোন ক্ষতি করার ইচ্ছাপোষণ করেন নি। কিন্তু আমাদের মধ্যকার মতানৈক্য এখনও বিদ্যমান। যা হোক, যে কেউই আমাকে ক্ষতি করে থাকুক না কেন, আজকের দিন থেকে আমি তা ভুলে গেছি এবং এ ব্যাপারে কোন দোষারোপ থেকে আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম।

ইবনে আতাউল্লাহঃ শায়খ ইবনে তাইমিয়্যা, আপনি আমার ব্যাপারে কি জানেন?

ইবনে তাইমিয়্যা: আমি জানি আপনি একজন পরহেজগার, সুশিক্ষিত এবং সত্যবাদী ব্যক্তি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সিরিয়া ও মিশরে আপনার মতো কেউ নেই যে আল্লাহকে এতো বেশী ভালোবাসে, তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে। তথাপি, আমাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আপনি আমার ব্যাপারে কি মনে করেন? আপনি কি দাবী করেন যে, আমি যখন বলি আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য কামনা (ইস্তিগ্বাছা) অবৈধ, এতে আমি ভ্রান্ত?

ইবনে আতাউল্লাহঃ কিন্তু নিশ্চয়ই, আমার প্রিয় সাথী, আপনি জানেন যে, ইস্তিগ্বাছা বা সাহায্য কামনা তাওয়াছছুল বা ওয়াসিলার জন্য সাহায্য (শাফায়াত) করার সমপর্যায়ের; এবং রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন তিনি যার সাহায্য চাওয়া হয়, কারণ আমরা তো তাঁরই পক্ষ থেকে শাফায়াতের কামনা করি।

ইবনে তাইমিয়্যাঃ এ ব্যাপারে, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহকে আমি অনুসরণ করি যা শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, সহীহ হাদীস শরীফে আছে: আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম] আমাদের পবিত্র কুরআনের একটি

আয়াতকেও আমি জড়িত করেছি: হয়তো বা আপনার প্রতিপালক আপনাকে (হে নবী) সম্মানিত স্থানে (মাক্বামে মাহমুদ) অধিষ্ঠিত করবেন [১৭ঃ৭৯]। এখানে মাক্বামে মাহমুদ অর্থ শাফায়াত। এছাড়া, যখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁর কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেন: ও আল্লাহ! যিনি চিরঞ্জীবী এবং কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হন না, যিনি তাড়া করেন ও মৃত্যুতে পতিত করেন, আমার মা ফাতিমা বিনতে আছাদের গুণাহ মাফ করে দাও, আমি, তোমার রাসূল এবং আমার পূর্বেকার রাসূলদের শাফায়াতের মাধ্যমে তিনি যেখানে প্রবেশ করবেন তা প্রশস্ত করে দাও। কারণ আপনিই দয়ার্দ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দয়ালু। [তাবারানী, কাবীর; ইবনে হিব্বা ও হাকীম এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনে শাইবাও জাবির (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।]

এটাই হচ্ছে শাফায়াত যা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য কামনার ব্যাপারে কথা হলো, এটা পৌত্তলিকতার গন্ধ বহন করে; কারণ নবীজী (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চাইবে না। [তিরমিযী, বাইহাকী, আহমদ, তাবারানী, ইবনে হিব্বান, আবু দাউদ, হাকীম; ইমাম নববী হাদীসটি তাঁর ৪০ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। একমাত্র ইবনে যাওজী এটিকে জাল বলেছেন।]

ইবনে আতাউল্লাহঃ আল্লাহ আপনাকে কামিয়াব করুন, হে ফকীহ! নবীজী (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো, তাঁকে তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহর দিকে রুজু করা তাঁর (ইবনে আব্বাসের) নিজস্ব প্রজ্ঞার মাধ্যমে- নবীজীর (সাঃ) সঙ্গে তাঁর স্বভাবগত পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। ইস্তিগ্বাছার অর্থ, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া এবং তা পৌত্তলিকতা মনে করা, আপনার এ ধারণা সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর প্রকৃত ঈমানদার কোন মুসলমান আছে কি যে মনে করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন ক্ষমতা আছে যদ্বারা তার উপর আল্লাহর নির্দিষ্ট কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনকিছু ঘটতে পারে? কোন সত্যিকার ঈমানদার আছে কি যে বিশ্বাস করে, তার ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আরোপ করতে পারে?

এছাড়াও, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অনেক বাক্য আছে যার অর্থ শাব্দিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। এ কথাটি, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার ভয়ের কারণে নয় এবং

পৌত্তলিকতা থেকে বাঁচার জন্যও নয়। কারণ, যে কেউ রাসূলের (সাঃ) সাহায্য কামনা করে তা শুধু তাঁর আল্লাহর নিকট শাফায়াতের অধিকারের সাহায্যকে কামনা করে, যেমন যখন আপনি বলবেন: এই খাদ্য আমার রুচিকে তৃপ্ত করে। খাদ্য স্বয়ং নিজেই কি আপনার রুচিতে তৃপ্তি দান করে? কিংবা আল্লাহ পাকই খাদ্যের মাধ্যমে আপনার রুচিতে তৃপ্তি দান করেন?

আপনি বলেছেন, আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন। আপনি কি কোন মুসলমানকে দেখেছেন, সে সাহায্যের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকেছে? আপনি যে আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এটা নাযিল হয় পৌত্তলিক এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য কৃত্রিম খোদাদের ডাকতো, তাদের ব্যাপারে। অথচ, মুসলমানরা যে একটি মাত্র উপায়ে রাসূলের (সাঃ) সাহায্য কামনা করে তাহলো, তাওয়াসসুল যার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন সেটির মাধ্যমে সাহায্য কামনা [বি হাক্কি হি ইন্দাল্লাহা] এবং তাশাফু বা শাফায়াতের কামনা, যার ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (সাঃ) দান করেছেন।

আপনি যে ইস্তিগ্বাছা বা সাহায্য চাওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ বলেছেন কারণ, এর মাধ্যমে পৌত্তলিকতার দিকে মানুষ ধাবিত হয়, সে ব্যাপারে কথা হলো- তাই যদি হয়, তাহলে আমাদেরকে আঙ্গুর ফল নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ এর দ্বারা শরাব তৈরী হয়। এছাড়া অবিবাহিত পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলতে হবে কারণ তা যদি না করা হয় তাহলে পৃথিবীতে ব্যভিচার ও জিনার উপায়-উপকরণ থেকে যাবে!

[শেষোক্ত মন্তব্যে দুজন শেখই হেসে উঠলেন] ইবনে আতাউল্লাহ আরও বললেন: আমি আপনার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ ইমাম আহমদ হাম্বল (রাহঃ)-এর আইনী থিওরী ও আপনার নিজের থিওরী সম্পর্কে পুরোদমে ওয়াকিফহাল আছি। আপনার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে কতটুকু সতর্ক থাকবেন তা-ও আমার জানা আছে। কিন্তু আমি এটাও বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, ভাষাগত যোগ্যতা এ পর্যন্ত হওয়া উচিত যে, কোন লেখার গুপ্ত ভেদ অনুধাবন করা যাতে সম্ভব হয়। কারণ অনেকসময় লেখার আসল অর্থ পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সুফিদের জন্য গুপ্ত ভেদ হলো রূহের মতো এবং শব্দগুলো এর দেহ। বাহ্যিক দেহের ভেতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা আপনাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। শব্দের রূহকে বুঝতে হবে।

ইবনে আরাবী (রাহঃ) এর ফুসুলুল হিকাম কিতাবের বিরুদ্ধে আপনি অনেক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তারা এমন কিছু বানোয়াট কথা এতে জড়িয়ে দিয়েছে যে, এগুলো তিনি মোটেই লিখেন নি। এছাড়া এতে এমন কিছু কথা লাগানো হয়েছে যা তাঁর মতো একজন ব্যক্তির পক্ষে লিখা আদৌ সম্ভবই নয়। যখন শায়খুল ইসলাম ঈয্জ ইবনে আব্দুস সালাম (রাহঃ) বুঝতে পারলেন ইবনে আরাবী বাস্তবে কি বলেছেন এবং এ ব্যাপারে গবেষণা করলেন; যখন তিনি কথাগুলোর আসল অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন অতীতে এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যের জন্য। তিনি শেষ পর্যন্ত এটা স্বীকার করলেন যে, মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রাহঃ) ইসলামের একজন ইমাম ছিলেন। [ইয্জ ইবনে আব্দুস সালাম মাক্বদিসি, জাবাদু খুলাসাতিত্তাসাওউফ (কায়রো ১৯৬১)]

ইবনে আরাবী সম্পর্কে আস শাদিলী (রাহঃ)-এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমি বলি, আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে, হযরত আবুল হাসান শাদিলী (রাহঃ) এরূপ কোন বক্তব্য পেশ করেন নি। বাস্তবে এই বক্তব্যটি প্রদান করেন তাঁর একজন শাগরিদ। এছাড়া, উক্ত শাগরিদ বাস্তবে শাদিলী (রাহঃ)-এর কোন কোন অনুসরণকারীদের ব্যাপারে বক্তব্যটি করেছিলেন। সুতরাং, তাঁর কথাগুলোর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে- যা তিনি (উক্ত শাগরিদ) আদৌ মন্তব্য করার ইচ্ছাপোষণ করেন নি।

এবার বলুন, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদিনা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ হাদীস শরীফে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী এর দরজা। [রিলায়ান্স অফ দ্যা ট্রাভেলার্স, পৃঃ ৯৫৪-৯৫৭। হাদীসটি তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন এটার সত্যতা যাচাই করা যায়নি। ইবনে মাইন বলেন এটা ভিত্তিহীন মিথ্যাবাদিতা, ইবনে যাওজী তার জাল হাদীসের পুস্তকে এটা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে দাক্বিক ঈদ বলেন, এই হাদীস স্কলাররা গ্রহণ করেছেন। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন এটা হাসান কিন্তু সহীহ নয়। হাকীমও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর মতে এটা জাল নয়। এটা সুয়ুতী বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ আরাঈ বলেন সত্য কথা হলো হাদীসটি হাসান, কারণ এটা অনেকে বর্ণনা করেছেন, তবে সহীহ, যায়িফ কিংবা জাল নয়। [রিসালাতুল মাউযুআত, পৃঃ ২৬]]

সায়্যিদিনা আলী (রাঃ) ছিলেন একমাত্র মুজাহিদ যিনি কোনদিন কোন যুদ্ধে গিয়ে বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসেন নি। তাঁর পরে কোন স্কলার বা ফকীহ এ দুনিয়ায় এসেছেন যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে জিহ্বা, কলম ও তরবারি দ্বারা জিহাদ করেছেন? তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। কুরআন এবং সুন্নাহর পর তাঁর বক্তব্যগুলোই আমাকে সারাজীবন উজ্জ্বল আলো দান করেছে।

ইবনে আতাউল্লাহঃ আচ্ছা, এবার বলুন, ইমাম আলী (রাঃ) কি কখনো কাউকে তাঁর নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত হতে বলেছেন? কারণ, এই দলের লোকেরা দাবী করেছে যে, ফিরিশতা জিব্রাঈল (আঃ) ভুলক্রমে আলী (রাঃ)-এর কাছে নাযিল না করে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট ওহী নাযিল করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) কি কখনো তাদেরকে দাবী করতে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁর দেহের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং ইমাম (তিনি) অতিমানবে রূপান্তরিত হয়েছেন? অথবা তিনি কি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফাতওয়া দেন নি যে, এদেরকে যেথায় পাওয়া যায় সেথায় গিয়ে হত্যা করতে হবে?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ ঐ ফাতওয়ার ভিত্তিতেই, আমি সিরিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি দীর্ঘ দশ বছরেরও অধিক কাল।

ইবনে আতাউল্লাহঃ এবং ইমাম আহমদ (রাহঃ) তাঁর কিছু অনুসারীদের কার্যাবলী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন যারা বাইরে গিয়ে মদের ঝুড়ি ভেঙ্গে দিয়ে (খৃষ্টানদের দোকানে যেয়ে কিংবা যেথায়ই তারা তা পেয়েছিল) বোতল ভাংচুর করে মেঝের উপর মদ ফেলেছিল। গায়িকা মেয়েদেরকে তারা মারধোর করেছিল এবং রাস্তায় রাস্তায় মানুষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। এসব তারা করেছিল মন্দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও হারাম জিনিষ থেকে মানুষকে রক্ষার নামে। অথচ, ইমাম সাহেব (ইমাম হাম্বল) এ ব্যাপারে কোনো ফাতওয়া দেন নি যে, তারা এরূপ কাজ করুক। এরপর এসব লোকদেরকে বেত্রাঘাত, জেলে প্রেরণ ও গাধার উপর লেজের দিকে মুখ করে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়েছিল।

এখন বলুন, আজ পর্যন্ত সক্রিয় কট্টর ও খারাপ প্রকৃতির কিছু হাম্বলীদের কার্যাবলীর জন্য কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) দায়ী? তারা তো এখনও মন্দের বিরুদ্ধে এবং হারামকে নিষিদ্ধকরণের নামে এসব উগ্রতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

আমার এই দীর্ঘ বক্তব্যের কারণ হলো এতটুকু বলা যে, শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রাহঃ) তাঁর অনুসারীদের কার্যাবলীর জন্য দায়ী নন। যদিও তারা তাঁর অনুসরণে মন্দের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে বলে দাবী করে। আপনি কি এ কথাটি বুঝতে পারছেন?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে এদের অবস্থান কোথায়? আপনারা সুফিদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) গরীবদের প্রশংসা করে বলেছিলেন, তারা ধনীদের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন গরীবরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে নিজেদের শরীরের পরিধান ছিড়ে ফেলতে শুরু করলো। এবং ঠিক এসময় জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করে রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, আল্লাহ এদের ছেড়া বস্ত্রের অংশগুলো গ্রহণ করেছেন; এবং জিব্রাঈল এক টুকরো নিয়ে যান ও তা আরশে আজীমে টাঙ্গিয়ে রাখেন। তারা এটাও দাবী করে, এ কারণেই সুফিরা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করে এবং নিজেদেরকে ফুক্বারা বা গরীব মনে করে!

ইবনে আতাউল্লাহঃ সকল সুফি এরূপ তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেন না। এই দেখেন না, আমার অবস্থা। আমার বাহ্যিক অবস্থার কোন্ জিনিষটির উপর আপনার অভিযোগ রয়েছে?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ আপনি তো শরীয়তের পাবন্দ এবং আল-আযহারের শিক্ষক।
ইবনে আতাউল্লাহঃ আল-গায্যালী (রাহঃ) শরীয়ত ও তাসাওউফের একজন ইমাম ছিলেন। তিনি আইনী দিক দিয়ে, শরীয়ত ও সুন্নাহর মাধ্যমে সুফিদেরকে উপস্থাপন করেছেন। এবং এ উপায়েই তিনি ধর্মীয় বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। আমরা জানি, তাসাওউফ বলে, নোংরামি নিষিদ্ধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। সত্যিকার সুফিরা জানেন তাদের হৃদয়ে আহলুস-সুন্নাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট ঈমানকেই ধরে রাখতে হবে।

দু'শ বছর পূর্বে একদল ভণ্ড সুফিদের আবির্ভাব ঘটেছিল যা আপনি নিজেই সমালোচনা করে বাতিল বলেছেন। এরা ফরয ও সুন্নত ইবাদাতকে সংকোচিত করতে চেয়েছিল; কম রোযা, কম নামায ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন এলাকায় ছুটাছুটি করে দাবী করতো, তাদেরকে আল্লাহর উপাসনার গোলামী থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ইমাম কুশায়িরী (রাহঃ) তাঁর রিসালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হক্ব পথের উপরও গভীর গবেষণা করেন যা ছিলো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক।

তাসাওউফের ইমামরা বাস্তব হাক্বিকাতে পৌঁছার জন্য শুধুমাত্র মানবিক চিন্তা-গবেষণার উপর ভরসা করেন না। কারণ, মানবিক গবেষণা সঠিকও হতে পারে আবার ভুলেরও হতে পারে। সুতরাং তাসাওউফের ইমামরা মানবিক গবেষণা ছাড়াও নিজেদের হৃদয়কে (ক্বলবকে) পবিত্রকরণ এবং নফসকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কিছু রূহানী সাধনার মাধ্যমে হাক্বিকাতের সন্ধানে ব্রত হন। তাঁরা এ সাধনায় দুনিয়াবী জিন্দেগীকে দূরে ঠেলে দেন, যেহেতু সত্যিকার আল্লাহর গোলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রেম ছাড়া অন্য কিছুতে নিজেকে জড়িয়ে দিতে পারে না। এটা একটি উচ্চ পর্যায়ের জিনিষ এবং যার মাধ্যমে আল্লাহর কোনো গোলাম হয়ে উঠে সাধক, স্বাস্থ্যবান (রূহানীর দিক থেকে) ও উন্নত। এটা এমন একটি সংস্কারমূলক চাকুরী যে, যার মাধ্যমে মানুষকে যেসব বস্তু মন্দ করে ফেলে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে- যেমন, টাকার লোভ এবং সমাজে যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা। অথচ এটা এমন একটি ব্যবসা যে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য রূহানী যুদ্ধ।

হে আমার বিজ্ঞ বন্ধু! যে কোন একটি লেখাকে তার শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করায় কোনো একব্যক্তি সময় সময় ভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে। আর এই শাব্দিকতাই আপনাকে ইবনে আরাবী (রাহঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে, যিনি ছিলেন আমাদের ধর্মের একজন ইমাম, যার কঠোর সাধনা সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত। তিনি যা লিখেছেন তা আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছেন; অথচ সুফিরা হচ্ছেন সাহিত্যের উস্তাদ, তাঁদের লেখায় লুকিয়ে থাকে গভীর অর্থ, এগুলো উচ্চ পর্যায়ের ভাষা যার মাধ্যমে রূহানী সম্পর্কিত উচ্চতর ভাব ও অনুভূতি ফুটে উঠে। এর মাধ্যমে অদেখা জগতের রহস্যাবলী প্রকাশিত হয়।

ইবনে তাইমিয়্যাঃ এই যুক্তি আপনার নিজের বিরুদ্ধে চলে যায়, আপনার পক্ষে নয়। কারণ, ইমাম কুশায়রী (রাহঃ) যখন তাঁর অনুসরণকারীদের দেখলেন তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়ছে, তখন তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমাদের যামানায় সুফি শায়খরা কি করছেন? আমি শুধু এটাই বলি যে, সুফিরা আগেকার যুগের আমাদের মহান ব্যক্তিদের (সালাফ) সুন্নাহকে অনুসরণ করুক: নবীজীর (সাঃ) সাহাবাদের মধ্যকার জাহিদ, এর পরের প্রজন্মের এবং এর পরের প্রজন্মের ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক যেটুকু সম্ভব। যে কেউ এরূপ অনুসরণ করে তাঁকে আমি পুণ্যবান ও ধর্মের ইমাম হিসেবে গণ্য করি। আর অহেতুক বিদআত ও পৌত্তলিকদের ধারণাকে আমদানী- যেমন গ্রীক ও ভারতীয় বৌদ্ধদের দর্শন কিংবা ঐ ধারণা যে মানুষ অবতার হতে পারে (হুলুল) বা আল্লাহর সঙ্গে মিশে যেতে পারে

(ইত্তিহাদ) অথবা সব সৃষ্টি মূলত একক (ওয়াহদাতুল-উজুদ) থিওরী এবং অন্যান্য অনুরূপ ব্যাপার যা আপনাদের শায়খরা মানুষকে বলেন, ইত্যাদি তো পরিষ্কার আল্লাহবিরোধী ও কুফর।

ইবনে আতাউল্লাহঃ ইবনে আরাবী একজন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি ইবনে হাযম আন্দালুচী (রাহঃ) এবং দাউদ আল-জাহিরী (রাহঃ)-এর অনুসারী ছিলেন। আর এরা তো ইসলামী মাযহাবের ক্ষেত্রে আপনাদেরই বিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিলেন, হে হাম্বলীরা! কিন্তু যদিও ইবনে আরাবী ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে জাহিরী ছিলেন তথাপি হাক্বিকাতকে বুঝার ক্ষেত্রে তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা ছিলো গুপ্তভেদ উদঘাটন করার প্রচেষ্টা। এ চেষ্টার মূলে ছিলো তারিকুল বাতিন তথা রূহানিয়্যাতের পদ্ধতি। এটা হচ্ছে নিজের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন বা তাহিরুল-বাতিন। [এই বক্তব্যটুকু ইবনে আতাউল্লাহর (রাহঃ) হিকাম গ্রন্থে এসেছে এভাবে, কোন কোন সময় আপনার হৃদয়ে আলো এসে সেখানে সৃষ্ট বস্তুর আকার দেখতে পায়, সুতরাং তা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে প্রস্থান করে। (কিতাবুল হিকাম, অনুবাদ ভির দানিয়েল, ১৯৪৮, পৃঃ ৫৩ থেকে)] কিন্তু গুপ্ত রহস্যের অনুসারীদের সকল সমান নয়। ভুলবুঝাবুঝি ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষার্থে আপনি ইবনে আরাবীর সাংকেতিক লেখাগুলোকে আরেকবার খোলামনে পাঠ করুন। এতে আপনার মধ্যে নতুন বুঝ আসবে। আপনি দেখতে পাবেন এগুলো বাস্তবে অনেকটা কুশায়রীর (রাঃ) লেখার অনুরূপ। ইবনে আরাবী আসলে তাসাওউফের ক্ষেত্রে যে রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো কুরআন ও সুন্নাহর ছায়াতলে, যেমনটি করেছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম [ইসলামের প্রমাণ] হযরত ইমাম গায্যালী (রাহঃ)। ইমাম সাহেব দেখিয়েছেন আক্বীদাগত কিংবা আইনী ছোটখাটো ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তা মূলত ভুলবুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব তর্ক-বিতর্ক মূল্যহীন। এর মাধ্যমে বাস্তব কোন ফায়িদা নেই। সুতরাং তিনি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দিকটি চিন্তা করে দেখুন এবং এটাই আসলে ধার্মিকতার দিক দিয়ে আল্লাহর গোলাম বা বান্দাহ হওয়ার মধ্যে স্বার্থকতা নিয়ে আসে।

হে আমার বিজ্ঞ বন্ধু, উপরোক্ত কথাগুলোর ক্ষেত্রে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে, না আপনি মুসলিম উলামার মধ্যকার মতানৈক্যকে বেশী ভালোবাসেন? ইমাম মালিক (রাহঃ) আক্বীদাগত দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি মোটেই পছন্দ করতেন না এবং বলতেন, যেই মুহূর্তে কেউ দ্বীনি ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার ঈমান ক্ষীণ হতে শুরু হয়। একইভাবে ইমাম গায্যালী (রাহঃ) বলেছেন,

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সর্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি যে মাধ্যমটি কার্যকারী হয় তাহলো হৃদয় বা ক্বলব। তবে এই ক্বলবের অর্থ বুকের মধ্যকার পেশীর তৈরী হৃদপিণ্ড নয় যা চোখের দেখা, কানের শ্রবণ, ত্বকের অনুভূতি, জিহ্বার স্বাদ ও নাসিকার গন্ধকে অনুভব করে। এই ক্বলব বলতে, আমি বলছি আল্লাহর সর্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণ গুপ্তভেদ যা উপরোক্ত পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবের বাইরে। আর অবশ্যই আহলে সুন্নাহতের লোকেরা সুফি আল-গায্যালীকে হুজ্জাতুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। [মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, হুজ্জাতুল ইসলাম, ঈমানের অলংকার, আবু হামিদ আত-তুসী -সালাউদ্দিন সাফাদি, ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪]

ইবনে আরাবী ও ইবনে ফারিদের মতে ধর্মীয় উপাসনা এবং দ্বীনি দায়িত্ব (তাকলিফ) পালন হচ্ছে এমন উপাসনা যার মিহরাব হলো আভ্যন্তরীণ দিক। শুধুমাত্র বাহ্যিক কিছু কাজকর্মই যথেষ্ট নয়। কারণ, উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদিতে দাঁড়ানো বা বসার মাঝে কি ফায়দা থাকতে পারে যদি একই সময় আপনার হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু [গ্বাইরুল্লাহ] স্থান করে নেয়? আল্লাহ ঐসব ব্যক্তিদের প্রশংসা করে কুরআন শরীফে বলেনঃ যারা তাদের ইবাদতে বিনয়ী [২৩ঃ২] এবং তিনি ঐসব লোকদের দোষারোপ করেছেনঃ যারা তাদের ইবাদতে অমনোযোগী [১০৭ঃ৫]। এটাই ইবনে আরাবী বলতে চেয়েছেন যখন তিনি লিখেনঃ প্রার্থনা হচ্ছে হৃদয়ের মিহরাব, অর্থাৎ উপাসনার আভ্যন্তরীণ দিকটি বাহ্যিক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে ইলমুল ইয়াক্বিনের উপর জ্ঞানার্জন মুসলমানের জন্য সম্ভব নয় এবং স্বয়ং ইলমে ইয়াক্বিন (আইনুল ইয়াক্বিন)-কে তো নয়ই- যে ব্যাপারে কুরআনে বর্ণনা এসেছে। তবে যদি কোন মুসলমান তার হৃদয়কে যাবতীয় দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করে দিতে সক্ষম হয় তাহলে হয়তো উপরোক্ত উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান আহরণ সম্ভব হতে পারে। আর ঐ জ্ঞানার্জনে দুনিয়া তথা গ্বাইরুল্লাহই হচ্ছে বিরাট পর্দা। গ্বাইরুল্লাহ থেকে তাকে মুক্ত হয়ে গভীর সাধনার মধ্যে নিমগ্ন হতে হবে। তখন ঐশি বাস্তবতা বা হাক্বিকাতের জ্ঞানে তার হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এর এ থেকেই তার হিদায়াতের সৌভাগ্য নসিব হয়ে যায়। আসল সুফিরা নিজেদের পরিশুদ্ধির জন্য ভিক্ষা করাকে জরুরী মনে করেন না। অবশ্যই না। আসল সুফিরা ওরা যারা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্য ও জিকির দ্বারা সজীব করে তুলেন এবং নফসকে বিলুপ্ত করে দেন।

হয়তো বা ইবনে আরাবী বাহ্যিক আলিমদের রোষানলে পড়েলিছেন এই কারণে যে, তিনি আক্বীদা, ফিকহ, বাস্তব ঘটনাবলী ও কাল্পনিক বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে তাদের অতিবাড়াবাড়িকে পছন্দ না করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এসব বিষয়ে জড়িত হয়ে তারা নিজেদের আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কতটুকু উদাসীন হয়ে পড়েছে। তিনি তাদেরকে মহিলাদের হায়েজ-নিফাসের মাসআলার আলিম বলে আখ্যায়িত করেছিলে। আল্লাহ আপনাকে তাদের দলে শরীক না করুন! আপনি কি ইবনে আরাবীর ঐ বক্তব্য পাঠ করেছেন যেখানে তিনি বলেনঃ যে কেউ শুধুমাত্র প্রামাণ্য দলীল এবং যুক্তিগত তর্কের উপর ভিত্তি করে তার ঈমানকে গড়ে তুলে, সে এমন ভিত্তির উপর তার ঈমান গড়েছে যার উপর ভসরা করা ভয়ংকর। কারণ, সে তো সর্বদা আলোচিত অভিযোগের ইতিবাচক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। আইনুল ইয়াক্বিন (হাক্বিকাত) কখনও মন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং তা হৃদয়ের গভীর থেকে বর্ষণ হয়। আপনি কি কখনও এমন সুন্দর, নিষ্কলুষ মিষ্ট ভাষায় কথা শ্রবণ করেছেন?

ইবনে তাইমিয়্যাঃ আপনি খুব ভালো বলেছেন, কিন্তু যা আপনি বললেন আপনার শিক্ষক ব্যক্ত করে গেছেন, ঠিক তা-ই যদি সত্যি তিনি বলতেন! কারণ, এরূপ হলে তিনি অবশ্যই কুফরী থেকে বহু বহু দূরে থাকতেন। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার যে ব্যাখ্যা আপনি আমাকে বললেন তা আমার মতে সঠিক নয়। [মুহাম্মদ জাকী ইব্রাহীম, উসূল-উসূল, কায়রো, ১৪০৪ হিঃ সং, পৃঃ ২৯৯-৩১০]

হযরত তাজউদ্দীন সুবকী (রাহঃ) [৭২৭ - ৭৭১ হিঃ]

শায়খুল ইসলাম হযরত তাজউদ্দীন সুবকী ছিলেন প্রখ্যাত সুফি শায়খুল ইসলাম হযরত তক্বীউদ্দীন সুবকী (রাহঃ) [মৃঃ ৭৫৬ হিঃ] এর সুযোগ্য পুত্র। তক্বীউদ্দীন ছিলেন প্রখ্যাত শায়খ হযরত ইবনে আতাউল্লাহর শিষ্য। তাজউদ্দীন সুবকী (রাহঃ) তাঁর মুঈদুন নিআম গ্রন্থের সুফি শিরোনাম পরিচ্ছেদে বলেন: আল্লাহ তাঁদেরকে (সুফিদেরকে) জীবন দান এবং গ্রহণ করুন আর তাদের সঙ্গে আমাদেরকে জান্নাতবাসী করুন। তাঁদের নিয়ে অতিবেশী কথা বলা হয়েছে এবং অতিবেশী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে যা বাস্তবে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সত্য কথা হলো, তাঁরা পৃথিবীতে সর্বদাই ইবাদতে মশগুল থাকেন।

শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-যুয়াইনী [ইমামুল হারামাইনের পিতা] বলেছেন: তাঁরা (সুফিরা) হচ্ছেন আল্লাহর লোক ও তাঁর স্বল্পসংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের বান্দাদের দলের অন্তর্ভূক্ত। তাঁদের জিকরুল্লাহর মাধ্যমে তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁদের

উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের ওয়াসিলায় আল্লাহ আমাদের উপর সহায় হন। [আস-সুবকী, মুঈদুল নিআম ওয়া মুবিদুল নিক্বাম, পৃঃ ১৯০]

ইবনে খালদুন (রাহঃ) [৭৩৩ - ৮০৮ হিঃ]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুক্বাদ্দিমা-তে বলেন: তাসাওউফ হচ্ছে উম্মাহর পরবর্তী যুগের একটি ইসলামী আইনের জ্ঞান। তবে তাসাওউফের ভিত্তি কিন্তু [অনেক পুরনো, কারণ তা] সালিফীনের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো এবং প্রখ্যাত আসহাব ও তাবিঈনদের মধ্যেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আর তাঁদের পথই হাক্বিকাত ও হিদায়াতের সঠিক রাস্তা।

সুফিদের মৌলিক রাস্তা হচ্ছে জগতে আত্মসংবরণ ও একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা [পূর্ণ তাওয়াক্কুল] করে থাকা; তারা জাগতিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য থেকে নিজেরদেরকে মুক্ত রাখেন; টাকা, আনন্দ, উপাধি ইত্যাদি থেকে তারা দূরে সরে থাকেন এবং এব্যাপারে অধিকাংশ স্কলার একমত; এছাড়া তারা মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

উপরোক্ত গুণাবলী আসহাব ও পূর্বসুরীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের শুরু ও এর পরে, এবং পরবর্তী প্রজন্ম থেকে যখন মানুষ দুনিয়াদার হয়ে উঠে, তখন যারা ইবাদতের প্রতি চরমভাবে জড়িত থেকে যান তারাই পরবর্তীতে সুফি নামে পরিচিত হন। [মুক্বাদ্দিমাত ইবনে খালদুন, পৃঃ ৩২৮]

ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী আল-মালিকী (রাহঃ) [মৃত ঃ ৭৯০ হিজরী]

তিনি ছিলেন উসুল ফিকহ শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁর প্রণীত মুয়াফফাক্বাত ফী উসুল শরীয়াহ গ্রন্থে লিখেছেন, আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভাষা (আরবী) আয়ত্ব করার মধ্যেই ইসলামী গবেষণা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা নিহিত। আরবী ভাষার উপর গভীর জ্ঞান ছাড়া ইজতিহাদ সম্ভব নয়।

তিনি আল-ইতিসাম নামক গ্রন্থে সুফিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে লিখেনঃ অনেক নির্বোধ মানুষ মনে করে সুফিরা শরীয়ত থেকে দূরে সরে যান। এরূপ বিশ্বাস করা মোটেই সঠিক নয়! কারণ সুফিদের সর্বপ্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুন্নাতের পূর্ণ

অনুসরণ করা এবং শরীয়ত যা নিষিদ্ধ করেছে তা থেকে বেঁচে থাকা। [আস-শাতিবী, মুয়াফফাক্বাত ফী উসুল শরীয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০]

তাঁদের রাস্তার (অর্থাৎ তরীকতের) প্রধান বক্তা, শায়খ আবুল ক্বাসিম কুশায়িরী ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁরা তাসাওউফ নামটি গ্রহণ করেছেন বিদআতীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল মুসলমানরা তাদের সময়ে নিজেদেরকে একমাত্র সাহাবী ছাড়া আর কোন উপাধিতে ভূষিত করেন নি। কারণ সাহাবী থেকেও উচ্চপর্যায়ের কোন মর্যাদাশীল উপাধি নেই। তাঁদের অনুসারীদের বলা হতো তা'বিঈ। এর পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয় এবং তা দিনদিন স্পষ্ট হয়ে উঠে। এদের মধ্যে মর্যাদাশীলদের (উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগারদের) বলা হতো জাহিদ এবং আবিদ। এরপর সব ধরনের বিদআত আত্মপ্রকাশ করে এবং আহলুস-সুন্নাহদের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যারা আল্লাহর প্রতি তাঁদের কর্তব্য-কাজে পুরো পাবন্দ ছিলেন, এবং নিজেদের হৃদয়কে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন, তাঁরাই শেষ পর্য তাসাওউফপন্থী নামে খ্যাত হন। এটা ভেবে দেখুন, এর মাধ্যমে আপনি জ্ঞানবান হবেন। আর আল্লাহ ভালো জানেন [আস-শাতিবী, ইতিসাম মিনাল কুতুব]।

হযরত জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাহঃ) [৮৪৯ - ৯১১ হিঃ]

শায়খুল ইসলাম সুয়ূতী (রাহঃ) ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং মুজতাহিদ ইমাম। তাসাওউফের উপর রচিত তাঁর তাঈদুল হাক্বিক্বিল আলিয়্যা ওয়া তাশয়িদিত তারিক্বিশ শাদিলিয়্যা গ্রন্থে বলেন: তাসাওউফ স্বয়ং একটি উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে কিভাবে অনুসরণ এবং বিদআত পরিহার করতে হয় তা শিক্ষা দেয়। তাসাওউফ আরও শিক্ষা দেয় কিভাবে নফসকে ছাফ করে সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।

কিছু শাফিঈ ইমামরা যেভাবে সুফিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তা আমি ভালো করে অধ্যয়ন করে দেখেছি। আমি একজনও সুফি দেখি নি যিনি এসব অভিযোগের আওতাভুক্ত হয়েছেন বা ছিলেন। বরং, এসব কর্মকাণ্ড ছিলো বিদআতপন্থীদের যারা সুফি হওয়ার দাবী তুলেছিল কিন্তু বাস্তবে তারা তা ছিলো না। হৃদয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চর্চা, এর বহুমূখী ব্যাধি যেমনঃ হিংসা, রিয়া, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য

অবশ্যকর্তব্য [ফরযে আইন]। [জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাহঃ), তাঈদুল হাক্কিক্বিল আলিয়্যা ওয়া তাশয়িদিত তারিক্বিশ শাদিলিয়্যা, সংঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দিকী জুমারী আল-হাসানী (কায়রো: মাতবাউল ইসলামিয়্যা, ১৯৩৪), পৃঃ ৫৬-৫৭]

ইমাম শাকাওয়ী (রাহঃ) [মৃঃ ৯০২ হিঃ]

ইমাম শাকাওয়ী (রাহঃ) ছিলেন হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানীর (রাহঃ) একজন প্রসিদ্ধ শিষ্য। ঐতিহাসিক, ফাতওয়াবিদ, হাদীস বিশারদ এই প্রখ্যাত মনীষী জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাহঃ) ও তক্বী উদ্দীন সুবকী (রাহঃ) এর মতো শাদিলীয়্যা সুফি তরীকার খলীফা ছিলেন। এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আবুল হাসান শাদিলী (রাহঃ)।

হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) রচিত আল-দাওয়ীল লামী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর বাবা জায়নুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ [মৃঃ ৮৭৪] কায়রো শহরের একজন সুফি ছিলেন। তিনি বাইবারিসিয়্যা নামক একটি সুফি দলের সদস্য হিসেবে কালাতিপাত করেন। আর এই দলের শিক্ষক হিসেবে হযরত শাকাওয়ীর (রাহঃ) তরীকতের শায়খ ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছেন। [হযরত শাকাওয়ী, আদ-দাওয়ীল লামী, (বৈরুত: দারুল মাকতাবাল হায়াত, ১৯৬৬), ৪, পৃঃ ১২৪-১২৫]

হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) তাঁর রচিত জাওয়াহিরুল মুকাল্লালা ফিল আখবারুল মুসালসালা গ্রন্থের হাদীস অধ্যায়ে তিনি ঐসব হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একমাত্র সুফিদের রিওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি তরীকতের খিরকা (খিলাফত) লাভ করেছি কায়রো শহরের শায়খ হযরত জায়নুদ্দিন রিদ্বওয়ান মুক্বরী (রাহঃ) এর কাছ থেকে। [এ জে আরবেরী, শাকাওয়ীয়ানা: এ ষ্ট্যাডি বেইজড অন দ্যা চেষ্টার বীটী এমএস আরার ৭৭৩ (লন্ডন: এমারী ওয়াকার লি, ১৯৫১) পৃঃ ৩৫]

একই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর একাধিক শিক্ষক ও হাদীসের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সুফি ছিলেন। আমরা এখানে এদের ক'জনের নাম উল্লেখ করলাম। এ নামগুলো হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ)-এর আদ-দাওয়ীল লামী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

আবু বকর মুহাম্মদ হাসী হালাবী শাফিঈ [মৃঃ ৮৪৮ হিঃ]: তিনি আলেপ্প শহরের বিস্তামিয়্যা সুফি তরীকার প্রধান শায়খ ছিলেন। তিনি হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ)-এর সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমায় দু'বছর অবস্থান করেন। হযরত শাকাওয়ী তাঁকে তরীকতের ইযাজাত দিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত এই ইযাজাতের মধ্যে বলেন: আমাদের শিক্ষক, পথ-প্রদর্শনের ইমাম, মুরিদীনের শিক্ষক, সুফি রাস্তার মুসাফির, সায়্যিদ আবু বকর হাসী আল-হালাবী, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং তাঁর পূর্ববর্তীদেরকেও [অর্থাৎ তরীকতের সিলসিলার সকল অলিআল্লাহর] রহম করুন এবং আমাদের প্রতি ও সকল মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। [হযরত শাকাওয়ী, আদ-দাওয়ীল লামী, ১১, পৃঃ ৯৬-৯৭, ৭৪-৭৫]

বদরুদ্দীন হোসাইন ইবনে সিদ্দীক আল-ইয়ামনী আল-আজাল [মৃঃ ৯০৩ হিঃ]: হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) তাঁকে ইযাজাত প্রদান করেন এবং নিজের সকল গ্রন্থাবলী শিক্ষাদানের অনুমতি দেন। [পূর্বোক্ত, ৩, পৃঃ ১৪৪-১৪৫]

আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আল-মাদানী আল-মারাগী [মৃঃ ৮৫৯ হিঃ]: হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। কায়রোর দুটি সুফি খানাকার প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্বপালন করেছিলেন। এগুলো হলো, জামানিয়্যা ও জামালিয়্যা খানকা। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় একজন তারিকে দুনিয়া হিসেবে অতিবাহিত করেন এবং ইমাম নববী (রাহঃ) এর গ্রন্থ, মিনহাজুত তালিবীন এর ব্যাখ্যা লিখেন। এছাড়া তিনি ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) এর ফতহুল বারীর উপর একটি সারসংক্ষেপ আলোচনা প্রকাশ করেন। শায়খুল আকবার ইবনে আরাবী (রাহঃ) এর সমর্থন প্রদানের কারণে তাঁকে পবিত্র কা'বাগৃহের সামনে একজন কট্টরবাদী শহীদ করে দেয়। [পূর্বোক্ত, ৭, পৃঃ ১৬২-১৬৫]

তক্বীউদ্দীন আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আল-ক্বালক্বাশান্দী [মৃঃ ৮৬৭ হিঃ]: তাঁর অপর নাম ছিলো আবু আব্দিল্লাহ। তিনি কায়রোতে সুফি খিরক্বা [খিলাফত] লাভ করেন। কথিত আছে, মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থানকালে তিনি একদা মাত্র তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ পাঠ করেছিলেন। তিনি কুদসে বাস করতেন। হযরত শাকাওয়ীর সঙ্গে এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত শাকাওয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। [পূর্বোক্ত, ১১, পৃঃ ৬৯-৭১]

তক্বীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-উক্বুবী [মৃঃ ৮৬১ হিঃ]: তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় হাদীস ও তাজভীদ শিক্ষা দেন। এখানেই হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন। [পূর্বোক্ত, ২, পৃঃ ২১২-২১৩]

কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-সিকান্দারী আল-সিওয়াসী [মৃঃ ৮৬১ হিঃ]: তিনি ছিলেন একজন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। প্রাথমিক জীবনে তিনি কায়রোর মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়্যা-তে শিক্ষকতা করেন। এরপর সেখানকার শায়খুনী সুফি খানকার প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। [পূর্বোক্ত, ৮, পৃঃ ১২৭-১৩২]

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-হুসাইনী আল-ক্বাহিরী আশ-শাফিঈ আস-সুফি [মৃঃ ৮৭৬ হিঃ]: তিনি ছিলেন কায়রোর আদালতে কাজী মুনাভীর ডেপুটী। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঈযজ উদ্দীন ইবনে জামাআ, জালালুদ্দিন বলক্বানী প্রমুখ। এছাড়া তিনি হযরত আসক্বালানীর (রাহঃ) বন্ধু ছিলেন। তিনি ফাতহুল বারী গ্রন্থ দু'বার কপি করেন। শিক্ষক ও মুহাদ্দীস হযরত আব্দুল্লাহ (রাহঃ) ইবনে আতির (রাহঃ) এর কিতাব আল-আনসাব গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা লিখেন। ইবনে আসক্বালানী (রাহঃ) দশজন ছাত্রকে হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ (রাহঃ) ছিলেন একজন। [পূর্বোক্ত, ৮, পৃঃ ১৭৬-১৭৮]

আবু খালিদ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আল-জিব্রিনী [মৃঃ ৮৬০ হিঃ]: তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, অশ্বারোহী এবং জিব্রিনের জাওযিয়া মসজিদের সুফি শায়খ। এখানেই শাকাওয়ী (রাহঃ) তাঁর সাক্ষাত লাভ করে তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। শাকাওয়ী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: তিনি ছিলেন সুদর্শন, বিনয়ী, দয়ালু, সাহসী এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। [পূর্বোক্ত, ৩, পৃঃ ১৯৭]

জাকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী আল-খাযরাযী আস-সাদী আল-মুক্বরী আস-সুফি [মৃঃ ৮৭৫ হিঃ]: তিনি ছিলেন ইবনে হাজার (রাহঃ) এর সহযোগী এবং লেখক হিসেবে সিদ্ধহস্ত। তিনি পঞ্চাশ খণ্ডে একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। হযরত শাকাওয়ী (রাহঃ) বলেন, তিনি ছিলেন স্থির-ধীর চরিত্রের, সমমনোভাবাপন্ন, অতি সহজে কেঁদে ফেলতেন ও বুদ্ধিদীপ্ত জবাবদাতা। [পূর্বোক্ত, ২, পৃঃ ১৪৬-১৪৯]

তিক্বাতুদ্দীন আবু আলী মাহমুদ ইবনে আলী আস-সুফি আল-খানিকী [মৃঃ ৮৬৫ হিঃ]: তাঁর জন্ম হয় কায়রোর খানিক্বাস সিরায়াকুসিয়্যা এলাকায় এবং এখানেই শেষ জীবনে তরীকতের শিক্ষাদান করেন। তিনি পবিত্র হজ্জ পালনকালে মক্কা মুয়াজ্জমায় মারা যান। [পূর্বোক্ত, ১০, পৃঃ ১৪০-১৪১]

আবুল ফারায আব্দুর রাহমান ইবনে খালিল আদ-দামেস্কী আস-সুফি [মৃঃ ৮৬৯ হিঃ]: তিনি ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। হযরত শাকাওয়ী কায়রোতে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি যখন দামেস্ক শহরের উমাইয়্যা মসজিদে হাদীস পড়াতেন তখনও হযরত শাকাওয়ী তাঁর কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। [পূর্বোক্ত, ৪, পৃঃ ৭৬]

হযরত জাকারিয়্যা ইবনে মুহাম্মদ আনসারী (রাহঃ) [মৃঃ ৯২৬ হিজরী]

শায়খুল ইসলাম হযরত জাকারিয়্যা আনসারীকে শায়খদের শায়খ বলা হতো। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, কাজী এবং মুফাস্‌সীর। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার হাইছামীর (রাহঃ) শিক্ষক ছিলেন এবং তাসাওউফের উপর অনেক বই লিখেছেন। এর মধ্যে হযরত কুশায়রী (রঃ) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রিসালার উপর তিনি একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) প্রকাশ করেন যা বহুলপ্রচারিত ছিলো।

এই গ্রন্থে তিনি তাসাওউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: তাসাওউফ হচ্ছে যৌক্তিকতার বিসর্জন। এছাড়া এটাও বলা হয়ে থাকে: এটা হচ্ছে তোমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে কঠোর সতর্কতার মধ্যে রাখা এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস চেতনার সাথে নেয়া; এছাড়া: এটা বাদশাহদের বাদশাহর দরবারের দিকে আরোহণের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা; এছাড়া: এটা হচ্ছে ভালো কাজের প্রতি মনোনিবেশ এবং মন্দকে পরিহার; এবং অন্যান্য ব্যাখ্যায় সুফিয়্যা বা সুফিদের এ নামে সম্বোধন করা হয় এজন্যে যে, তাঁদেরকে আল-হাক্ব- আল্লাহ, পবিত্র [সাফাউন] বানিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন অকুণ্ঠভাবে [আখলাকা লাহুন-নিআম] যা ইচ্ছা তার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে, তাঁদেরকে সম্মতি প্রদান করে। [জাকারিয়্যা আনসারী, শারহুর রিসালাতিল কুশায়রিয়্যা (কায়রো: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাতিল কুবরা, ১৩৩০/১৯১২) পৃঃ ১২৬]

আব্দুল ওয়াহহাব শারানী (রাহঃ) [মৃঃ ৯৭৩ হিঃ]

তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং শরীয়ত ও তাসাওউফের উপর অনেক বইয়ের রচয়িতা। এর মধ্যে তাবাক্বাতুল কুবরা গ্রন্থটি

প্রসিদ্ধ। এই কিতাবের একটি উদ্ধৃতি রিলায়ান্স অফ দ্যা ট্রেভেলার্স গ্রন্থে এভাবে হয়েছে: সুফিদের রাস্তা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটার মূলে আছে নবী-রাসূল ও পুণ্যাত্মাদের অনুসরণে জীবন-যাপন। কুরআন-সুন্নাহ ও প্রাজ্ঞবান ব্যক্তিদের [প্রসিদ্ধ আলীমদের] সর্বসম্মত মতামতের বিরুদ্ধে কোন কাজ হলে একমাত্র সেটাকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে। যদি এসব বিরোধী কিছু না হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্পর্কে (সুফিদের রাস্তা) এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ রাস্তায় যে কেউ যেতে চায় যাক এবং যে চায় না বিরত থাকুক। সুতরাং সুফিদেরকে নিন্দা করার কোন কারণ আর অবশিষ্ট থাকে না, একমাত্র কারো প্রতি অপরের নিম্ন পর্যায়ের মতামত ছাড়া কিংবা তারা যা করে তার ভুলবুঝাবুঝি ব্যতীত যা মূলতঃ বে-আইনী কাজ। [নূহ হা মীম কেলার, রিলায়ান্স অফ দ্যা ট্রেভেলার্স, পৃঃ ৮৬৩-৮৬৪]

শারানী আরো বলেন: যে কেউই সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করবে, সে বুঝতে পারবে যে অলিআল্লাহদের মধ্যে একজনও শরীয়তের বাইরে অবস্থান করেন না। কিভাবে তারা শরীয়তের বাইরে যেতে পারেন যেখানে সুফিদের প্রতিটি আমল ও কাজ প্রতিমুহূর্তে ঐশী আইনের আওতাধীন? বাস্তবে, এই রাস্তা সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নয় তাদের মনে সন্দেহের আসল কারণ হলো, ঐশী আইনের গুপ্ত তত্ত্ব তাদের জ্ঞানের বাইরে। এজন্যই জুনায়িদ বাগদাদী [মহান আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন] তাঁর যুগের লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আমাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুফিরা সর্বদাই বলেন, যারা শরীয়তকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করে না তাদেরকে সুফি রাস্তায় চলা বা সুফি তরীকা শিক্ষা দেয়া অসম্ভব। আরবী ভাষার উপর মৌলিক জ্ঞানের জরুরতের কথাও তারা বলেন। সুতরাং সত্যিকার কোনো সুফি শায়খ শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ আছেন এবং এর বিপরীত কথা সত্য নয়।

মোটকথা, সুফিদের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার কথা কেউ অস্বীকার করে না, শুধুমাত্র ওদের ছাড়া যারা এই রাস্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। [তাবাক্বাতুল কুবরাল মুসাম্মা বি লাওয়াক্বিহাল আনওয়ার ফি তাবাক্বাতিল আখির (১৩৭৪/১৯৫৪), (পুনঃমুদ্রণ, বৈরুত: দারুল ফিকর, এনডি) ১:৪, রিলায়ান্স অফ দ্যা ট্রেভেলার্স, পৃঃ ৮৬৩-৮৬৪]

ইবনে হাজর আল-হাইছামী [মৃঃ ৯৭৪ হিজরী]

শায়খুল হাদীস ইবনে হাজর আল-হাইছামী হযরত জাকারিয়্যা আনসারী (রাহঃ)-এর একজন ছাত্র ছিলেন। ইবনে হাজর শেষ যুগের শাফিঈ স্কলারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ফাতওয়ার উপর গ্রন্থ রচনা করেন। একদা তাঁকে সুফিদের যারা সমালোচনা করে তাদের উপর ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়। প্রশ্নটা ছিলো: যারা এ কাজ করে তাঁদের কি কোন শরীয়তসম্মত ওজর আছে? তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ ফাতওয়ায়ে হাদিসীয়্যা গ্রন্থে এর জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেন, এদেরকে (সুফিদেরকে) সমালোচনা করার ফাঁদে পড়া থেকে প্রত্যেক বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মজ্ঞানীদের দূরে থাকা অবশ্যকরণীয়- কারণ, এটা একটি আত্মঘাতী বিষ, যেমনটি অতীতে আমরা দেখেছি এবং আজও দেখছি [ইবনে হাজর আল-হাইছামী, ফাতওয়ায়ে হাদিসীয়্যা, কায়রো: আল-হালাবী, ১৯৭০, পৃঃ ৩৩১]।

তিনি সুফিদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া দিয়েছেন। এর পূর্ণ বিবরণী এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেনঃ আমাদের শায়খ, আরিফ, স্কলার হযরত আবুল হাসান বাকরী [মৃত ঃ ৯৫২ হিজরী] আমাকে হযরত জাকারিয়্যা সাবিক্ব [আল-আনসারী] এর ছাত্র জামালুদ্দিন সাবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আস-সাবি ইবনে ফরিদ (রাহঃ)-কে সমালোচনা করতেন। তাঁর তরীকাকে ভ্রান্ত ভাবতেন। একদা সাবী স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত দিবস এসে গেছে এবং তিনি একটি বোঝা বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এরপর কেউ বলতে লাগলো: ইবনে ফরিদের দল কোথায়? সাবী তখন এগিয়ে গেলেন [ঐ দলে যোগদান করতে]। সাবি বলেন, আমি যখন কাছে গেলাম তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এই দলের নয়, সুতরাং ফিরে যাও! আমি জাগ্রত হয়ে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম এবং অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হলাম। সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ ইবনে ফরিদ সম্পর্কে আমার ধারণা ও মন্তব্যের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলাম। এর পর থেকে আমার কোন সন্দেহ রইলো না যে, ইবনে ফরিদ একজন আউলিয়া। পরবর্তী বছর একই রাতে আমি ঐ একই স্বপ্ন দেখলাম। তবে এবার আমি শোনলাম আহ্বানকারী বলছে, ইবনে ফরিদের দল কোথায়? তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। সুতরাং আমি তাদের সঙ্গে গেলাম এবং বলা হলো, আসো, কারণ এখন তুমি তাদের দলের।

[আবুল হাসান বাকরী ইবনে হাজরকে আরও বলেন] এই ব্যাপারটি ভালো করে চিন্তা করুন। কারণ, এই স্বপ্নটি হচ্ছে ইসলামের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির। এতে প্রতীয়মান

হয়, আর আল্লাহই ভালো জানেন- তাঁর শায়খ জাকারিয়্যা আনসারী (রাহঃ)-এর বরকত ও দোয়ার ফলেই তিনি তাঁর ধারণাকে পাল্টিয়েছিলেন। অন্যথায় অন্যান্যদের মতো তিনিও অন্ধ থেকে যেতেন এবং দিশেহারা ও ধ্বংসের শিকার হতেন!

[হে ইবনে হাজর!] তুমি যদি জিজ্ঞেস করোঃ কিছু কিছু প্রখ্যাত স্কলার যেমন আল-বুলক্বীনী এবং অন্যান্য, এবং সবশেষে আল-বিক্বাঈ তাঁর ছাত্ররা এবং আরও অনেকে যাদের কাছে তুমি নিজেই [ইবনে হাজর হাইছামী] লেখাপড়া করেছো, তারা সুফিদের প্রত্যাখ্যান করেছেন সুতরাং, আপনি কেন এরূপ বলতে আগ্রহী?

আমি জবাবে বলবোঃ আমি এই রাস্তা পছন্দ করেছি কয়েকটি বিশেষ কারণে, এর মধ্যে একটি হলোঃ আমাদের শায়খ শারহার রাওদ গ্রন্থে সাদ উদ্দীন তাফতাজানী [মৃত ঃ ৭৯১ হিজরী] [সাদ উদ্দীন মাছউদ উমর আল-তাফতাজানী, শাফিঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ, তিনি তাফসীর, কালাম, উসূলে ফিকহ, মানতিক, ব্যাকরণ, বক্তৃতা ও দর্শন শাস্ত্রের উপর গ্রন্থাবলী লিখে গেছেন।], যিনি ছিলেন ইসলামের সত্য আবিষ্কারক, তাঁর ফিল্ডের সম্রাট, তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তিনি (তাফতাজানী) ইবনে মুক্বরির বক্তব্য: যে কেউ ইবনে আরাবীর দলের কুফরীকে সন্দেহ করে সে নিজেই কাফির এই কথার জবাবে বলেন, সত্য কথা হচ্ছে, ইবনে আরাবী ও তাঁর দলের সবাই হচ্ছেন উম্মাহর শিরোমণি। আল-ঈয়াফিই, ইবনে আতাউল্লাহ প্রমুখ ঘোষণা দিয়েছেন, ইবনে আরাবী অবশ্যই আল্লাহর অলী ছিলেন। সুফি (আ'রিফরা) যখন একত্বের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যান তখন তাঁদের মুখ থেকে যে ভাষা বেরিয়ে আসে তা সাধারণ্যের কাছে বিভ্রান্তিকর ও আক্বীদা-বিরোধী বলে মনে হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু হুলুল (অবতার) কিংবা বিলীন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের ইমামরা যেমন, রাফিই তাঁর আল-আযিয গ্রন্থে, ইমাম নববী তাঁর রাওদুল মাজমু গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেনঃ যখন কোন মুফতিকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, অমুক ব্যক্তির কিছু বক্তব্য আক্বীদা-বিরোধী এ ব্যাপারে কি করা যায়? তখন সেই মুফতিকে সাথে সাথেই ঐ বক্তব্যকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কিংবা তার রক্ত ঝরানোর ফাতওয়া দেয়া ঠিক হবে না। প্রথমে বক্তব্যকারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে তার এসব উক্তির অর্থ কি, বক্তব্যকারীর ব্যাখ্যা শ্রবণ না করে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া কখনও সঠিক হবে না।

পথনির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করো - আল্লাহ আপনাকে পথনির্দেশ করুন! আপনি দেখবেন ঐসব অস্বীকারকারী যারা এই মহান ব্যক্তিকে (ইবনে আরাবী) আক্রমণ করে এবং তাঁকে সরাসরি কাফির বলে, তারা অন্ধভাবে পাহাড়ে আরোহণ করছে এবং দৃষ্টিহারা উটের মতো হোচট খাচ্ছে। অবশ্যই আল্লাহ তাদের দৃষ্টি হরণ করেছেন এবং তাদের কর্ণে তালা দিয়েছেন তাই তারা তা [সুফিদের অবস্থা] অনুধাবন করতে পারে না। এর ফলে তারা পতিত হয় যাতে তারা পতিত হতে চায়। এতে তারা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞতার শিকার হয়, তাদের জ্ঞান আর তাদের কোন কাজে আসে না।

সুফিদের মহৎ জ্ঞান এবং দুনিয়ার [গাইরুল্লাহর] প্রতি অনাসক্তি ও আল্লাহর প্রতি আসক্তি তাঁদের নির্দোষ হওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। তাদের বিরুদ্ধে ঐসব ভয়ংকর অভিযোগ থেকে তারা মুক্ত। সুফিদের বক্তব্য হচ্ছে হাক্বিকাতের মহান বাণী। এসব বাণীর পূর্ণ ব্যাখ্যা না জেনে তাঁদের রাস্তাকে অস্বীকার করা বোকামী। আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এই কারণে যে, সুফিদের বিরুদ্ধবাদীদের সকলেই সেই উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একজনও মুকাশাফাতের (গুপ্ত রহস্য উদঘাটনের জ্ঞান) জ্ঞানে জ্ঞানবান নয় কিংবা দূর থেকেও এর গন্ধ অনুভব করেছে; কোন একজনও বিশ্বস্তভাবে কোনো এক অলিকে অনুসরণ করেনি। সুতরাং সে কিভাবে তাদের বক্তব্যের ভাষাকে অনুধাবন করতে পারে?

[হে ইবনে হাজর!] তুমি যদি অভিযোগ আনো এই বলেঃ তাদের বক্তব্য হাক্বিকাতের কথা কোন রূপক ব্যাপার নয়, এ মতামতের উপর আমি একমত নয়, সুতরাং যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে আমাকে সুস্পষ্ট কিছু দেখিয়ে দেন?

আমি বলবোঃ এটা না মানা হচ্ছে একগুঁয়েমী। মনে করুন, আমি যা বলেছি তাতে আপনি একমত নন। সুতরাং সঠিক উপায়ে এ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এইঃ এই বক্তব্যটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে এরপর এটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু এটার অর্থ এটা বা ওটা বলে এটা কুফর এরূপ বক্তব্য শুরু থেকেই উপস্থাপন করা বাস্তবে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুফিদের সমালোচকরা নসিহতের নামে এসব কথা বলে, এটা মোটেই নসিহত নয়। এটা বাড়াবাড়ি।

আপনি কি লক্ষ্য করেন না, ইবনে মুক্বরিদ এর ভালো নসিহত যদি ভালো উদ্দেশ্যে হতো তাহলে তিনি যে কেউ ইবনে আরাবী দলের লোকদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সে নিজেও কাফির হবে এরূপ বাড়াবাড়িমূলক মন্তব্য করতেন না। এই বক্তব্যের

মাধ্যমে তিনি শুধু ইবনে আরাবীর অনুসারী নয় বরং যতো লোকই তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের সবাইকেও কাফিরে রূপান্তরিত করলেন। এই কট্টরতার দিকে দৃষ্টি দিন যা সকল বাড়াবাড়িকে হার মানিয়েছে এবং ইমামদের গণ্ডিসীমার বাইরে চলে গেছে। তাদের স্পর্ধা এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, ইবনে আরবী ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে সন্দেহকারীদের পর্যন্ত কাফির বলেছে। [আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে] আপনি মহিমান্বিত, এটা তো জঘন্য অপবাদ! [২৪ঃ১৬]। [আরও ইরশাদ হয়েছে] যখন তোমরা মুখে প্রচার করছিলে, এবং মুখে বলছিলে যা তোমরা জানো না, আর তা তুচ্ছ ভেবেছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিলো গুরুতর [২৪ঃ১৫]।

লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই বলা হচ্ছে, ইবনে আরাবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে কাফির হিসেবে গন্য করা সকল উম্মাহর জন্য ফরয! কারণ অন্যথায় সকলেই কাফির হয়ে যাবে- কেউ কি এরূপ চিন্তা করে? বাস্তবে তিনি [ইবনে মুক্বরিদ] নিজেই তার আর-রাওদ গ্রন্থে বলেছেন, যে কেউ কোন মুসলমানকে তার কোন গোনাহের কারণে কাফির বলে, অথচ এই গোনাহের ব্যাখ্যা ইতিবাচকভাবে করে না, তাহলে সে নিজেই কুফরী গোনাহ করলো। কিন্তু এই তো- তিনি নিজেই মুসলমানদের এক বিরাট দলকে কুফরীর অভিযোগ করছেন। এছাড়া, তার ব্যাখ্যা মূল্যহীন- এর কারণ হলো, যাদের বিরুদ্ধে তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাদের উপর নেতিবাচকভাবে করেছেন। কারণ, তিনি শুধু তাদের কথাগুলোর বাহ্যিক দিক বিবেচনা করেছেন।

আর প্রখ্যাত আলিম-উলামাসহ যারা মনে করেন শায়খুল আকবর ইবনে আরাবী (রাহঃ) এবং সুফিদের বক্তব্য হচ্ছে তাদের সম্মুখে নিষ্কলুষ নূরের ঝলক স্বরূপ, এবং তারা অলি-আবদাল হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করেন, তাদেরকে কি কোন মুসলমান কাফির বলে সম্বোধন করে আক্রমণ করতে সাহস করবে? কেউই সাহস করবে না এই কারণে যে, এর মাধ্যমে সে নিজেই কাফির হয়ে যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত কট্টরতার প্রমাণ এবং মুসলমানদের এক বিরাট অংশের উপর আঘাতের সামিল। আমরা আল্লাহর দরবারে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করি এবং এই অভিযোগকারীদের ক্ষমা করে দিতে তাঁর কাছে মিনতি করছি।

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা সকলের নিকট জানা আছে যে, যে কেউ সুফিদের বিরোধিতা করে আল্লাহ তার জ্ঞানকে কোন কাজে লাগতে দেননা, এবং তার উপর পতিত হবে কঠোর শাস্তি (শারীরিক ও মানসিক রোগ), এবং ইতোমধ্যে অনেকের উপর

তা পতিত হতেও আমরা দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ আল-বিক্বাঈ [মৃঃ ৮৮৫ হিজরী], আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ স্কলার, ইবাদতগুজার, খুব বুদ্ধিমান এবং প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী। হাদীস ও ফিকহের উপর তার জ্ঞান ছিলো অগাধ। তিনি অনেক বই-পুস্তকও লিখেছিলেন। কিন্তু তার লেখালেখিও জ্ঞান কারো কোন কাজে লাগেনি। তিনি মুনাসাবাতুল কুরআন নামক ১০ খণ্ডে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের কিছু আলিম ছাড়া কেউ জানেন না। যদি এরূপ কোন গ্রন্থ অলি-আল্লাহদের উপর বিশ্বাসী [অর্থাৎ সুফিদের উপর বিশ্বাসী] যেমন আমাদের শায়খ জাকারিয়্যা (রাহঃ) এর মতো কেউ লিখতেন তাহলে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হতো, কারণ বাস্তবে এরূপ গ্রন্থের প্রণেতা খুবই অল্পজন আছেন। কিন্তু তা-ও কোন কাজে আসেনি। [আল-বিক্বাঈ অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় সুফিরা ও ইলমে তাসাওউফের উপর আক্রমণ করেছিলেন।]

আল-বিক্বাঈ অস্বীকৃতি জানাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে একাধিক বই-পুস্তক লিখেন। সবগুলোই ছিলো অতি বেশী কট্টরতা এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত। কিন্তু এ কাজের কঠোর খেসারত তাকে দিতে হয়েছে। এমনকি, শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়। বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় কিন্তু তিনি কাতরভাবে কিছু বন্ধু-বান্ধব ও ক্ষমতাবানদের নিকট জীবনভিক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত মিশরের সালিহিয়্যায় তিনি তওবা করে নতুনভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জীবনরক্ষা করেন।

এই ঘটনার পর থেকে কেউ ইবনে-বিক্বাঈর বই-পুস্তকের ধারে-কাছেই যায়নি। কারণ তারা জানতেন এসব বই থেকে কোন ফায়দা হাসিল হবে না।

তার এক শিষ্য বলেন, আমি নিজে একদা আল-বিক্বাঈর সামনে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখনও জানতে পারি নি যে, তিনি সুফিদের বিরোধী। আমি তার ছাত্র ছিলাম। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট পেতেন। একব্যক্তি বললো, হুজুর! শায়খ উমর ইবনে ফরিদ (রাহঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি জবাব দিলেন, তিনি একজন কবি ছিলেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আর কি মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি ছিলেন কাফির। আমি এই বক্তব্য শ্রবণ করে সেখান থেকে উঠে আসতে বাধ্য হলাম। এরপর আমি ফিরে আসলাম তার নিকট বসে কিছু পাঠ করার জন্য এবং বুঝতে চেষ্টা করলাম তার উপরোক্ত মন্তব্যের জন্য তওবা করেছেন কি না। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম তিনি গুরুতর অসুস্থ, প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। আমি বললাম, আপনি যদি ইবনে

ফরিদকে আল্লাহর অলি হিসেবে বিশ্বাস করেন, তাহলে আমি মনে করি আল্লাহ আপনাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য করবেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার এই অবস্থা (রোগ) বহুদিন ধরে আছে। আমি বললাম, তথাপিও। তিনি বললেন, ঠিক আছে- আমি তাই করলাম! এরপর সত্যিই তিরি আরোগ্য হয়ে উঠলেন।

একদা আমি তার সঙ্গে হেটে বেড়াচ্ছিলাম এবং তাঁর আক্বীদাকে সঠিক করার চেষ্টায় রত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যা মনে করি তাহলো তিনি কাফির নন কিন্তু তাঁর বক্তব্য অবশ্যই কুফরী। এই কথা শ্রবণ করে আমি তার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করলাম। তার রোগ কেনদিনই সম্পূর্ণরূপে কমে নি।

আল-বিক্বাঈর এক ছাত্র শায়খ নূরুদ্দিন মাহালীও বলতেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কথা হলো আমি তাকে কাফির মনে করি না, তবে তার বক্তব্যগুলোর (ওয়াজের) ব্যাপারে কথা হলো এসব কথার মধ্যে কুফরী জড়িত। [উল্লেখ্য, আজকের কিছু বাহ্যিক আলিমদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দুই শয়তানের মধ্যে এক শয়তান উক্তি শোনা যায়। তারা সুফিদেরকে সার্বিকভাবে কাফির পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যখনই কোন বিশেষ শায়খের ব্যাপারে মন্তব্য করার কথা বলা হয় তখনই তারা জবাব দেয়, আমি তাকে কাফির বলে বিবেচনা করি না, কিন্তু তাদের বক্তব্যে কুফরী জড়িত আছে! কিন্তু আমাদেরকে হযরত হাইছামীর হুঁশিয়ারীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি বলেছেন, সুফিদেরকে সমালোচনা করা হচ্ছে আত্মঘাতী বিষ- এর মাধ্যমে ঈমানের ভীষণ ক্ষতি হয়। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি।]

[হে ইবনে হাজর!] তুমি যদি জিজ্ঞেস করোঃ কোন কোন সুফি বিরোধীদের জ্ঞানকে কি আল্লাহ মুসলমানদের জন্য উপকারী করেন নি?

আমি বলবোঃ দু'দল অস্বীকারকারী আছেঃ প্রথমতঃ ঐসব লোকদের কথা যা আমরা ইতোমধ্যে [উপরে] তুলে ধরেছি। মুসলমান সকাশে ভালো বক্তব্য প্রদান তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না একমাত্র কট্টরতা ছাড়া। এ কারণে তারা যাচ্ছেতাই বিশ্বাস করতো। তাদেরকে ঐ রোগে ধরেছিল, সমসাময়িকদের তুলনায় তারা আলাদা [যশ-খ্যাতির লোভে] হিসেবে নিজেদের পরিচিত করতে চেয়েছিল। [আজকের যুগেও এর প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে ইসলামী চিন্তাবিদ লকব লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত কিছু আমল-আক্বীদার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এর উদ্দেশ্য মানুষকে হিদায়াতের রাস্তায় আনয়ন মোটেই নয়, বরং নিজেকে মুজতাহিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

অথচ বাস্তবে এরা প্রকৃত কোনো মুজতাহিদের মাহাত্ম্যের ধারে-কাছেও যাবার যোগ্যতা রাখেন না। তবে তাদের বক্তব্য দ্বারা সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হন ঠিকই। আল্লাহ আমাদেরকে এদের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং এদেরকে হিদায়াত দিন।] সুতরাং তারা এসব বাক-বিতণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করে নিদেজেরকে হিরো বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তা করতে যেয়ে তারা বিপথগামী হয়েছে। তাদের বক্তব্যে বাস্তবতার কোন সম্পর্কই ছিলো না। [আল-হাইছামী, ফাতওয়ায়ে হাদিসীয়্যা, পৃঃ ৫২-৫৪]

মুল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) [মৃঃ ১০১৪]

তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম। মুল্লা ক্বারী পবিত্র কুরআনেরও মুফাস্সীর ছিলেন। তিনি তাসাওউফের উপর ইতিহাস রচনাসহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে মিশকাতাল মাসাবিহ এর উপর একাধিক খণ্ডে আল-মিরক্বাত, কাজি ঈয়াজ এর উপর আস-শিফা [দুই খণ্ড] এবং ইমাম গায্যালীর এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের উপর আইনুল ইলম ওয়া জাইনুল হিলম [দুই খণ্ড] সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি হিজবুল আযম নামক একটি জিকিরের বইয়ের প্রণেতা। বইটি ইমাম যালুজীর প্রখ্যাত জিকিরের গ্রন্থ দালাইলুল খাইরাত এর অনুসরণে রচিত। এ দুটি বই থেকে এখনও বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মুসলমান জিকির-আজকার করে থাকেন।

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের উপর তাঁর আলোচনার ভূমিকায় তিনি লিখেন: আমি হুজ্জাতুল ইসলামের এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের উপর এই পুস্তকটি রচনা করেছি এই আশায় যে তাঁর শব্দাবলী থেকে যে বরকতের স্রোতধারা প্রবাহিত হয় তা থেকে কিছুটা পাওয়া। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী নিষ্কলুষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া আমি এটাও আশা করি, সুফি শায়খদের পাতা [লেখা] থেকে যে সুফল বেরিয়ে আসে তা থেকে কিছুটা আহরণ করা ও কিয়ামতের দিন তাঁদের সাথে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা- যদিও তাঁদের তুলনায় আমি এক অত্যন্ত নগণ্য খাদিম, আমার আশার মূলে যে জিনিষটি সক্রিয় তাহলো তাঁদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের বিরহে ডুবে থাকা। [মুল্লা ক্বারী, শারহু আইনিল ইলম ওয়া জাইনিল হিলম, ১, পৃঃ ১]

হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে পবিত্র করার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন: মহাত্মনের মহাত্মনরা (আকাবীর) সারাজীবন দু'রাকাআত নামায আদায় করার আশা করেছেন নিজেদের নফসের সঙ্গে কথোপকথন না করে, কিন্তু পারেন নি। সুতরাং এ অবস্থায়

উপনিত হওয়ার আশা করা আমাদের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা বটে। অথচ যদি কেউ মাত্র অর্ধেক সময় [এক রাকাআত] কিংবা এমনকি এক তৃতীয়াংশ সময়ও নিজের মনে ওয়াসওয়াসা ও ভিন্ন চিন্তা-ভাবনা জাগ্রত হওয়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তথাপি সে হবে ঐ ব্যক্তির মতো, যে ভালো জিনিসের সঙ্গে মন্দের সংমিশ্রণ করে, কিংবা এক গ্লাসভর্তি শিরকার মধ্যে পানি ঢালে: এরফলে অবশ্যই শিরকা পড়ে যাবে কারণ পানি ও শিরকা একই সঙ্গে গ্লাসের ভেতর কোনভাবেই সংকুলান হবার নয়। আল্লাহর নিকট আমরা সাহায্য চাই! [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮]

ইমাম গায্যালীর উপর আলোচনা গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদটি হয়তো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এতে কুরআনের আয়াত: তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে [রাসূলকে] অনুসরণ করো এবং [এতে] আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন [৩ঃ৩১], সম্পর্কে ইমাম সাহেব ও ক্বারী সাহেবের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যাটি আল-হারাওয়ীর কিতাব সদ মাইদান নামক ফারসী গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যের অনুরূপ। মুল্লা আলী ক্বারী হযরত হাসান বসরীর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন: হাসান বসরী (রাহঃ) বলেছেন, যে কেউ [সত্যিকার অর্থে] আল্লাহকে চিনে সে তাঁকে ভালোবাসে, এবং যে কেউ [সত্যিকার অর্থে] এই দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে সে এটা থেকে দূরে থাকে। এই উক্তি তুলে ধরার পর মুল্লা সাহেব সুফিদের রাস্তায় যেসব আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে তা অবিশ্বাস না করার জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, এসব কথার মূলে আছে পবিত্র কুরআন শরীফ, সুতরাং এগুলো অবিশ্বাস করা হলো কুরআনকে অবিশ্বাস করার নামান্তর। এরপর তিনি বলেন: প্রেম ও রাস্তার নিয়মানুবর্তিতা [মুহাব্বত ও সুলুক] হচ্ছে, প্রেমের সারণী ও বিরহ, এবং যে কেউ প্রেমের সায়র থেকে সূরা পান করবে না, সে কখনও প্রেমের রূপ জানতে পারবে না। প্রেমের অন্য কোন মানে নাই, একাগ্রতার প্রেরণা-দান ছাড়া। যে কেউ প্রেমকে অস্বীকার করলো সে প্রকারান্তরে অস্বীকার করলো পরিচিতি [উনস], প্রেমানুভূতি [শাওক্ব], স্বাদ [দ্বাওক্ব], বিলোপতা [মাহু], বদান্যতা [সাখাওয়াহ], আত্মবিলুপ্তি [ফানা], অস্তিত্বতা [বাক্বা], সংকোচন [ক্বজ] এবং প্রসারণ [বাস্ত] ইত্যাদি ও প্রেমের পথের বিভিন্ন অবস্থা এবং সুফি পথিকদের স্তরসমূহকে। [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫]

ইবনে আবিদীন (রাহঃ) [১১৯৮ - ১২৫২ হিজরী]

খাতিমুল মুহাক্কিক্বীন হিসেবে প্রসিদ্ধ এই আলিম, একাধিক ব্যক্তি বসে একত্রে সশব্দে জিকির পড়ার ব্যাপারে একটি ফাতওয়ার বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হলো,

শিফাউল আলিল ওয়া বাল্লুল গ্বালিল ফি হুকমিল ওয়াসিয়্যা বিল খাতামাতিত্তাহলিল। ইবনে আবিদীন এতে লিখেন: দুই দলের ইমাম [সুফি ও ফুক্বাহা] হযরত জুনায়িদ বাগদাদীকে (রাহঃ) জিজ্ঞেস করা হলো: একদল লোক আছে যারা ওয়াজদ (আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পদ্ধতি)-এর মধ্যে জড়িত হয়েছে। তারা নিজেদের দেহকে এদিক সেদিক হেলিয়ে দুলিয়ে জিকির করে, এদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি জবাব দিলেন: তাদের আল্লাহর সঙ্গে খুশী থাকতে দাও। তারা হচ্ছে ঐসব লোক যাদের আকর্ষণ (তরীকতের) রাস্তায় চলার ফলে চুর্ণবিচুর্ণ হয়েছে, তাদের বক্ষদেশ চেষ্টার ফলে বিদীর্ণ হয়েছে এবং তারা তা সহ্য করতে অপারগ। তাদের অসহ অবস্থা থেকে ক্ষণকালের জন্য রেহাই পাওয়ার আশায় এসব করাতে তাদের কোন দোষ নেই। তারা যা অনুভব করছে তা যদি তুমি অনুভব করতে তাহলে অবশ্যই তাদের চিল্লাচিল্লির ব্যাপারটি নিয়ে কোন অভিযোগ আনতে না।

ইবনে আবিদীন আরও লিখেন: তরীকতের সালিকরা একমাত্র আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই জানে না এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। যখন তারা তাঁর জিকির পড়ে তখন তারা কাঁদতে থাকে এবং যখন তাঁর শোকর করে তখন আনন্দিত হয়; যদি তারা তাঁকে পায় তাহলে ক্রন্দন করে এবং দর্শন করলে শান্ত হয়; তাঁর পবিত্র উপস্থিতির মাঝে যদি তারা হাটে তাহলে তারা গলে যায়; কেউ কেউ তাঁর অনুগ্রহে সম্পূর্ণ মাতাল এবং নিজেদের দৃষ্টি হারিয়েছে জিকির আজকারে তারা একত্রে জড়িত হয়ে যে সঙ্গীত (সামা) পরিবেশন করে তাতে হাক্বিকাত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাস্তবতা প্রকাশ পায়, এতে একমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা করা হয়। আমরা এদের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ করি না। যে উপায় অবলম্বন করে তারা আল্লাহর ইশকে আত্মহারা হয়ে এসব করে তা তরীকতের একটি স্তর। [ইবনে আবিদীন, সপ্তম চিঠি, শিফাউল আলিল ওয়া বাল্লাল গ্বালিল ফি হুকুমিল ওয়াসিয়্যা বিল খাতামাতিত্তাহলিল, পৃঃ ১৭২-১৭৩]

ইমামে রব্বানী হযরত আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহ:) [৯৭১ - ১০৩৪ হিজরী]

ভারত উপমহাদেশে সপ্তদশ দশকে মুজাদ্দিদীয়া সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ধর্মমত 'দ্বীনে ইলাহী'-কে এই মহাত্মন অলিআল্লাহ নির্মূল করেছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দির সংস্কারক হিসাবে মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছিলেন। মাকতুবাত নামক গ্রন্থে তিনি

তরীকতের স্তর বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন: 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহর মধ্যে লীন হওয়া) এবং 'বাকা বিল্লাহ' (আল্লাহ দ্বারা বাকী থাকা) -এ দুয়ের মুরাকাবা (ধ্যান) যখন সাধকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সে নিশ্চিতরূপেই ঈমানের উপর মারা যায়। (ইসলামী তাসাওউফের স্বরূপ নামকরণে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত 'দালাঈলুস সুলুক' গ্রন্থের ২৯ পৃ: দ্র:)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ:) [১৭০২ - ১৭৬২ ঈসায়ী]

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত এই মহান ইসলামী চিন্তাবিদ সুফি দার্শনিক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বীয় পিতার কাছ থেকে তরীকতের 'খিলাফত' লাভ করেন। তাসাওউফের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন কিতাবে মন্তব্য করেছেন। তার প্রণীত একটি কিতাবের নাম দুর-ই-শাহীন। তিনি এতে বলেন, "হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ছিলেন প্রথম সুফি, প্রথম মযজুব এবং প্রথম আ'রিফ"।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ:) 'ওয়ায়েসী' তরীকার অনুসারী ছিলেন। তিনি এই তরীকার গুণগান বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, "ওলিদের সিলসিলার মধ্যে একটি তরীকা আছে যাকে বলে ওয়ায়েসিয়া তরীকা। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত ওয়ায়েস আল-ক্বারনী (রাহ:)। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহানী মুবারক থেকে সরাসরি ফায়েজ হাসিল করেন। একইভাবে ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ হযরত শায়খ বদরুদ্দীন (রাহ:) ফায়েজ হাসিল করেন।" [আশাতাল লামাত শারীয়াহ ওয়াল মিশকাত; পৃ: ২১]

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রাহ:) [১১৫৭ - ১২৩৯ হিজরী]

শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রাহ:) ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দীস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ:) এর সুযোগ্য সন্তান ও উত্তরসূরী। ভারতবর্ষে আযাদী আন্দোলনের একজন সূর্যসৈনিক ছিলেন শাহ আব্দুল আজিজ। তিনিই ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করা ফরয বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। 'ভারতবর্ষ দারুল হারব' এই ঘোষণার ফলেই পরবর্তীতে সশস্ত্র আযাদী আন্দোলন শুরু হয়। শাহ আব্দুল আজিজ তাফসীর, ফিকহ, তাসাওউফ ইত্যাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এসব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাবের নাম 'ফাতওয়ায়ে আজিজিয়া'। তিনি এতে লিখেছেন: "সুন্নিরা শরীয়ত ও তরীকতের উপর

নির্ভরশীল। তারা মনে করেন, এগুলোই হলো দ্বীনের সর্বোত্তম ও মহান সূত্রাবলী।" স্বীয় শায়খের 'তাওয়াজ্জুহ', 'জিকির' ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "রূহ দেহের মধ্যে স্পন্দন যোগায়, কিন্তু সে নিজের জীবন প্রাপ্ত হয়েছে ঐশী আলোকবর্তিকা থেকে। হে আমার প্রিয় বন্ধু! এ কথাটি পুরোপুরিভাবে বুঝা তেমন সহজ নয়। অনবরত জিকির ও মুরাকাবায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখা এবং ঊর্ধ্ব জগতে ভ্রমণ করা সালিকের একান্ত ইচ্ছা ও কামিল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ ছাড়া সম্ভব নয়।" [ফাতওয়ায়ে আজিজিয়া, খণ্ড ২, পৃ: ১১২]

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রাহ:) [১৭৮৬ - ১৮৩১ ঈসায়ী]

মুসলিম ভারতের প্রখ্যাত মরদে মুজাহিদ বালাকোটের ময়দানে শাহাদতবরণকারী হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রাহ:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা:) এর বংশধর ছিলেন। তিনি শাহ আব্দুল আজিজ (রাহ:) এর খলীফা ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনা ও জিহাদের মধ্য দিয়েই তার জীবন উৎসর্গ হয়।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ:) [১২৩১ - ১৩১৫ হিজরী] এবং তাঁর বিশিষ্ট ক'জন দেওবন্দী শাগরিদ

হাজী সাহেব (রাহ:) ছিলেন 'আকাবীরের শায়খ'। তিনি প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট ক'জন দেওবন্দী মুরীদ ও খলীফার উপর তিনি প্রায়ই খুব গর্ববোধ করতেন। এদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ:), হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাহ:), হযরত মাওলানা কাসীম নানুতুবী (রাহ:), শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রাহ:) এবং শাইখুল ইসলাম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রাহ:) এর কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শায়খ অবশ্য হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ:) এর নিকট থেকে 'খিলাফত' লাভ করলেও তিনি হিজাজে অবস্থানকালে হাজী সাহেব (রাহ:) এর সান্নিধ্যে থেকেই তরীকতের জিকির-মুরাকাবার সবক নিয়ে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আমরা এখানে এ কথাটিও উল্লেখ করতে পারি যে, শাইখুস সুন্নাহ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ:) এবং লিসানুল হিকমাহ হযরত মাওলানা কাসীম নানুতুবী (রাহ:) স্বীয় পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ:) এর সঙ্গে ১৮৫৭ সালে শ্যামলীর ময়দানে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। যা

হোক নিম্নে আমরা হাজী সাহেব (রাহ:) লিখিত বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এ থেকে ইলমে তাছাওউফের উপর আকাবীরে দেওবন্দের মহাত্মন ব্যক্তিদের সাধনা কী উচ্চ পর্যায়ের ছিলো তা সহজেই প্রমাণিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রাহ:) প্রায়ই বলতেন: "আল্লাহ তাঁর গোলামদের মধ্যে ইস্তিলাহী আলীম নন এমন কিছু ব্যক্তিদেরকে বিশেষ 'লিসান' [জিহ্বা] প্রদান করেন; হযরত শামসে তিবরিযিকে দিয়েছিলেন মাওলানা রুমী, এবং তিনি (মাওলানা রুমী) শামসে তিবরিযির শিক্ষাকে প্রচার করেন। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক আমাকে মওলুবী কাসিমকে দিয়েছেন।" [দ্বিয়াউল কুলুব, পৃ: ৭২]

জানা থাকা দরকার যে, 'ইস্তিলাহী আলীম' তাদেরকেই বলে যারা কোন মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনের সনদ গ্রহণ করে থাকেন। হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ:) এদিক থেকে ইস্তিলাহী আলীম ছিলেন না- তিনি কোন মাদ্রাসা থেকে সদন গ্রহণ করেন নি- কিন্তু শরীয়ত ও তরীকতের উপর পূর্ণ জ্ঞানবান এবং কামিল ওলিআল্লাহ ছিলেন অবশ্যই।

একদা হাজী সাহেব (রাহ:) বলেন: "আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইমদাদুল্লাহ! তুমি কি নিয়ে এসেছ? জবাবে কাসিম ও রশীদকে প্রদান করে আমি বললো, এ দু'জনকে নিয়ে এসেছি।" [নকশে দাওয়াম, পৃ: ২৯]

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) [১২৮০ - ১৩৬২ হিজরী]

উপমহাদেশে আধুনিক যুগে হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর মতো স্বনামধন্য লেখক হয়তো আর কেউ জন্মেন নি। মুসলিম চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সাধারণ ও বিশেষকরে ইসলামের জ্ঞানান্বেষণে তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছে। প্রায় ১০০০ গ্রন্থের প্রণেতা এই জ্ঞানতাপস মুসলমানদের জন্য রেখে গেছেন ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডার। উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে এই জনপদের সঠিক ইসলামী ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন অসম্ভব। এখানে তাসাওউফের উপর রচিত তার গ্রন্থাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

পীরের মাধ্যমে কিভাবে ইলমে মা'রিফাতের জ্ঞান হাসিল হতে পারে তার একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকাকালীন একদা হাজী সাহেব তাঁর এই প্রিয় শাগরিদকে [থানভী (রাহ:]–কে) বললেন: "নাতী! (তিনি আদর করে তাঁকে নাতী বলতেন) তুমি আমার খাস কুতুবখানা (লাইব্রেরী) থেকে যা ইচ্ছে উপহার হিসেবে নিয়ে যাও।" জবাবে থানভী সাহেব বললেন: "জনাবওয়ালা! এসকল কিতাবে আপনি কী রেখেছেন? এগুলোতে রূহানিয়্যাতের মুখোশ মাত্র। এর পরিবর্তে অনুগ্রহ করে আমার সীনায় কিছু দিয়া দিন।" বলাই বাহুল্য উত্তম শাগরিদের উত্তম প্রস্তাবে পীর সাহেব অত্যন্ত আনন্দবোধ করলেন। তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি খুশী হয়ে বললেন: "হ্যাঁ, সত্য বলতে কি? কিতাবে কি-ই বা আছে? সবই তো সীনায়।" এই ঘটনাটি মাওলানা থানভী (রাহ:) প্রায়ই স্মরণ করে সাথে সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

"শত কিতাব শত পৃষ্ঠা অগ্নিদাহ করো।
হক্বের নূরে বিভোর নামে তব আত্মা ভরো।" [হায়াতে আশরাফ]

তিনি বলেন: তিনিই হলেন বুজুর্গ ব্যক্তি যার মধ্যে নিম্নলিখিত নিদর্শনসমূহ রয়েছে : (১) প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান থাকা (২) ঈমান মুতাবিক আমল সম্পূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী হওয়া (৩) দুনিয়ার প্রতি লোভী না হওয়া এবং বুজুর্গির দাবী না করা (৪) কোন কামিল পীরের সান্নিধ্যে থাকা এবং (৫) উলামায়ে কেরামের সম্মান করা। [মাসিক আল-বালাগ, আল্লামা তকী উসমানী ও রফী উসমানী কর্তৃক সম্পাদিত, জুন - ১৯৭৮]

তিনি আরও বলেছেন: আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে দিল ও রূহ তাজা হয় এবং গুণাহ মাফ হয়। [তাযকিরাতুল আওলিয়া]

শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ:) [১২৯৬ - ১৩৭৭ হিজরী]

ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই ওলিআল্লাহ ইসলামী রেনেসাঁর কিংবদন্তী, শায়খে তরীকত ও নিবেদিতপ্রাণ উস্তাদ ছিলেন। হযরত মাদানী (রাহ:)-কে শাইখুল আরব ওয়াল আজম বলা হতো। তিনি শুধু দারুল উলূম দেওবন্দেরই শাইখুল হাদীস ছিলেন না, দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে পবিত্র মসজিদে নববীতে হাদীস শরীফের দারস দিয়ে

গেছেন। মদীনা শরীফে তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন মাজহাবের আরব ও অনারব অসংখ্য ছাত্র ছিলেন।

ইলমে তাসাওউফের উপর তাঁর বিচরণ ছিলো সম্রাটতুল্য। তবে স্বভাবগতভাবে তিনি অতিশয় প্রচারবিমুখ ছিলেন। হযরত কাসীম নানুতুবী (রাহ:) -এর ন্যায় তিনি নিজের রূহানী কামালাত সর্বদা লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসতেন। [শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ:) - ড. মুশতাক আহমদ; ইফাবা, পৃ: ৩৬৭]

হযরত মাওলানা মাদানী (রাহ:) হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ:) -এর খলীফা ছিলেন। তবে তাঁর প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দ (রাহ:) যার সাথে তিনি মাল্টায় কারাবরণ করেন। উস্তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে যেয়ে অনুমতি থাকা সত্ত্বেও শাইখুল হিন্দ জীবিত থাকাবস্থায় কখনও কাউকে মুরীদ করেন নি। উস্তাদের মৃত্যুর পরও বাইআতের ক্ষেত্রে তিনি হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাহ:) -কে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন এবং মুরীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষীদের বলতেন, আপনারা বরং হাকিমুল উম্মাতের কাছে মুরীদ হোন। যা হোক মহাত্মন এই ওলিআল্লাহ দ্বীনের কাজে সারাটি জীবন অবিরাম চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁরই বরকত ও ফায়েজ থেকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। তিনি ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সিলেট শহরের মানিক পীরের টিলার বিপরীতে স্থাপিত খিলাফত বিল্ডিংয়ে হাদীস শরীফের দারস দিয়েছেন। [সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ]

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রাহ:) প্রাথমিক জীবনে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুঃশাসন ও নির্যাতনে তখন ভারতের অবস্থা এমন নাজুক ছিলো যে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে মনে মতো যেনো পুলসিরাতের উপর হাঁটা হচ্ছে। তখন শাইখুল ইসলাম মাদানী (রাহ:) মানুষকে এই মুসিবত থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে জমিয়তে উলামার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন। আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর ব্যস্ততা দেখে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র) একদা বলেন ঃ একদিন আমি মাওলানা মাদানী (র)-কে বললাম, হযরতের সঙ্গে আমার লড়তে মন চায়। তিনি বললেন আপত্তি নেই মন ভরে লড়াই করুন। বললাম, হুজুর মাওলানা গাঙ্গুহী ও হাজী সাহেব (র) আপনার ওপর যে খিদমতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার কথা কি কিছু মনে আছে, নাকি দেশ স্বাধীন করার কাজেই ব্যস্ত থাকবেন? মাওলানা মাদানী (র) বললেন, এ খিদমতের কথাও আমার স্মরণ আছে, ভুলি নি। এ উদ্দেশ্যেই প্রতি রমযানে সিলেটে অবস্থান করি। মাওলানা যাকারিয়া (র) বলেন, এরপর যখনই তিনি সিলেট

যেতেন, ফিরে এসে সালেকীনদের দু'একটা চিঠি তিনি আমাকে দেখাতেন এবং বলতেন, দেখুন তো এসব কিসের চিঠি?" [তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃ: ৪৯১]
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হযরত মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) [১৩১৯ - ১৩৯১ বাংলা]

হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) সিলেট বিভাগের এক শীর্ষ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মগত ওলি এবং শাইখুল ইসলাম মাদানী (রাহ:) -এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) বলতেন, শুধু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় না। আল্লাহকে চিনতে হলে প্রয়োজন বিশ্বাস এবং ভক্তির। তারচেয়েও বেশী প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। তিনি আরো বলতেন, কামনা ও বাসনা থেকে মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই মানুষের আত্মশুদ্ধি সম্ভব। [হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) -এর জীবন ও খিদমাত, মাওলানা কবির আহমদ খান, পৃ: ৮২]

হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) যখন গভীর রাতে মাওলার প্রেমসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের তরঙ্গে নিমজ্জিত, তখন প্রেমিকের কণ্ঠে ভেসে উঠতো নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি:

নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে তোমার পানে চাইবো গো,
লান-তারানী বলনা যতো দেখবার আশায় থাকবো গো।
হৃদয় য'দিন রইবে বুকে ধ্যানে তোমার থাকবো গো,
বলতে য'দিন পারবো কথা গান তোমারই গাইবো গো।
এ জগতে প্রেম তোমারই পাগলা মোরে করছে গো,
মরলেও আমি প্রেম অনলে কবরেতে জ্বলবো গো।
পাগলা মনকে কি দিয়া আর শান্ত আমি রাখবো গো,
চোখ বুজিলে রং মহলে তোমায় যদি পাইনা গো।
আমি তুমি, তুমি আমি, আর কিছু তো পাইনা গো,
যেদিকে চাই তোমায় দেখি আমার 'আমি' আর কোথায় গো।

[হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) -এর জীবন ও খিদমাত, মাওলানা কবির আহমদ খান, পৃ: ৯০]

আল্লাহর অলিগণ বিভিন্ন রং ও ঘ্রাণের হয়ে থাকেন। হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) এর হালতের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় তিনি যেনো তেমনি ছিলেন যেমন কবি বলেন:

অর্থাৎ: আমি সে ব্যক্তির উপর বিস্ময় প্রকাশ করি যে (আমার সম্বন্ধে) বলে, আমি আল্লাহকে স্মরণ করেছি, আমি কি কখনো তাঁকে ভুলে যাই যে, ভুলে যাওয়াকে স্মরণ করে থাকি? আমি যখন তোমাকে স্মরণ করি তখন আমি মরে যাই। তারপর জীবিত হই। তোমার সাথে মিলনের আবে হায়াত না হলে আমি জীবিত হতাম না। আমি প্রবল ভালোবাসা লয়ে জীবিত হই এবং প্রেমের আতিশয্যে মরে যাই। সুতরাং আমি কতবার তোমর উপর মরবো এবং জীবিত হতে থাকবো? আমি পিয়ালার পর পিয়ালা প্রেম মদিরা পান করেছি। না এ মদিরা নিঃশেষ হয়, আর না আমি পরিতৃপ্ত হই। [হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহ:) -এর জীবন ও খিদমাত, মাওলানা কবির আহমদ খান, পৃ: ৭৪-৭৫]

মোটকথা, ইলমে তাসাওউফ ও তাসাওউফের খিদমাতগার মহাত্মন অলি-আল্লাহদের উপর্যুক্ত দীর্ঘ এ আলোচনা বাহ্যদর্শীদের নিকট হতে পারে শুধু তথ্য ও ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু অন্তর্দর্শীদের নিকট তা আরো গভীর তাৎপর্য বহন করবে এটা আমাদের বিশ্বাস। তারা এখান থেকে গ্রহণ করবেন জীবন গঠনের দিকনির্দেশনা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মার পরিশুদ্ধি, হৃদয়ের উত্তাপ, আদব ও আখলাকের পুঁজি এবং ক্বলব ও রূহের গিযা। ইমাম আবু হানীফা (রাহ:) বলেন:

الحكايات عن العلماء و محامنهم أحب الى من كثير من الفقه الأنها اداب القوم واختلاقهم

অর্থাৎ: উলামাদের ঘটনা ও কর্ম-কীর্তির আলোচনা আমার কাছে বহু ফিকহী আলোচনার চেয়ে প্রিয়। কেননা তাতে রয়েছে সালাফের জীবন-সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুর্য। এর স্বপক্ষে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গ্রন্থটি রচনার দুঃসাহস।

আর আমাদের বিশ্বাস যেহেতু 'তাযকিয়ায়ে নফস' এর সাধনা ছাড়া সত্যিকার অর্থে ঈমানের পরিপক্কতা ও খোদাপ্রাপ্তি অতি কঠিন ব্যাপার, তাই এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে সকলে ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব অনুধাবন করে কোন কামিল মুর্শিদের নিকট তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করবেন। আমাদের একটিমাত্র আবদার, অনুগ্রহ করে সকলেই দু'আর সময় এই অধম লেখকদ্বয়কে আল্লাহর পবিত্র দরবারে মাগফিরাত কামনাসহ স্মরণ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর নৈকট্য ও রেজা হাসিলে তাওফিক দিন। আমীন।

লেখক পরিচিতি

মাওলানা কবির আহমদ খান

কবির আহমদ খান ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানাধীন নিজপাট লামাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আফতাব উদ্দীন খান এবং মাতার নাম মুছাম্মাত ছায়ারুন নেছা। আশরাফুল উলূম নামক মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন। আরবী ভাষাসহ কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন শেষেই 'আলিম' হওয়ার গৌরব অর্জন করতে হয়। তবে তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এরজন্য প্রয়োজন কোন কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করা ও তাসাওউফের রাস্তায় আত্মনিয়োগ। মাওলানা কবির আহমদ খান এই লক্ষ্যর্জনে প্রখ্যাত অলিআল্লাহ, শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রাহঃ) এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা (রাহঃ) এর বিশিষ্ট খলীফা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জীর (দাঃবাঃ) নিকট বাইআত গ্রহণ করেন। কবির আহমদ খান হযরত শায়খে রেঙ্গা (রাহঃ) এর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা হযরত ফখরুল ইসলাম খিজির সাহেব (দাঃবাঃ) এর কন্যাকে বিয়ে করে এই খ্যাতনামা পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়েছেন। উল্লেখ্য, তার মামা শ্বশুরও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি হচ্ছেন মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড 'আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ' এর সম্মানিত মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনরত হযরত মাওলানা আবদুল বাছিত বরকতপুরী (দাঃবাঃ)।

কবির আহমদ খান ছোট থেকেই লেখালেখির প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি ৫ম শ্রেণীতে থাকা কালেই লেখালেখি শুরু করেন। সে সময় প্রাক্তন সংসদ সদস্য মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'তৌহিদী পরিক্রমা' নামক ম্যাগাজিনে 'আখিরাতের চিন্তা' শিরোনামে তার প্রথম নিবন্ধ প্রকাশ হয়। মাওলানা কবির আহমদ খান এ পর্যন্ত দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। প্রথমটির শিরোনাম 'কওমী মাদ্রাসার অবদান ও আসআদ মাদানী (রাহঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম হলো 'হযরত শায়খে রেঙ্গা (রহ.)-এর জীবন ও খিদমাত'। উভয় গ্রন্থই পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তিনি জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসার ইতিহাসের উপর একটি বই

লিখছেন। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, হুসাইন আহমদ ও তার যৌথ সম্পাদনা এবং রচনায় সিলেট বিভাগে কওমী মাদ্রাসার ইতিহাসের উপর আরেকখানা বৃহৎ গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে তরুণ লেখক কবির আহমদ খান 'আদর্শ লেখক পরিষদ বাংলাদেশ' এর প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক এবং 'জালালাবাদ লেখক ফোরামের' পাঠাগার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপাল করছেন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলিয়ে কামীল শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রাহঃ) এর বিশিষ্ট খাদিম ও খলীফাদের মধ্যে অন্যতম, সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের গৌরব কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী ১৯৫৭ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর উপজেলাধীন বনগাঁও গ্রামের একটি সুশিক্ষিত মুসলিম সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী আলী আসগর (রাহঃ) ও মাতার নাম মমরাজ বিবি।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর প্রপিতামহের নাম শাহ রজব মঞ্জিল (রাহঃ)। তিনি সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার একজন উচ্চ পর্যায়ের সুফি দরবেশ ছিলেন। তার এক চাচা মাওলানা আবু ইউসুফ (রাহঃ) ১৯৩৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারিগ হয়ে আসেন। অপরদিকে বাড়ির অধিকাংশ লোকই সাধারণ উচ্চশিক্ষিত থাকায় ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর মধ্যে একদিকে ইসলাম ও সুফিতত্ত্ব এবং অপরদিকে জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব পড়ে। নিজস্ব বাড়িতে শতাধিক বৎসর পূর্বে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী আমজদিয়া প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের ঝিগলী জুনিয়র হাই স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার্জন সমাপ্ত করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ১৯৭২ সালে বৃটেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বিলেতে দীর্ঘ ৬ বৎসর লেখাপড়া শেষে ১৯৭৮ সালে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী ছোট থেকেই লেখালেখির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিলেতের একাধিক বাংলা ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করতেন। তিনি পরবর্তীতে কবি আব্দুল মুকিত মুখতারের সম্পাদনায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী সমাচার' ও 'সাপ্তাহিক হিজরত' নামক দু'টি ইসলামী পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী ইসলাম ও বিজ্ঞানের উপর অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত ৭টি গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছে।

এগুলো হলো:

১. **'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'** - হলি মিডিয়া (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত।

২. **'হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. জীবনের শেষ ক'টি দিন ও অমৃত বাণী'** - আমীন ফাউন্ডেশন (বাংলাদেশ ও ইউকে) থেকে প্রকাশিত।

৩. **'বাইতুল্লাহর মেহমান'** - 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী' [সিলেট] থেকে প্রকাশিত।

৪. **'কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায'** - 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী' [সিলেট] থেকে প্রকাশিত।

৫. **'মাহবুব নবীর মাহবুব সুন্নাত'** [বঙ্গানুবাদ] - 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী' [সিলেট] থেকে প্রকাশিত।

৬. **'মা-বোনদের নামায'** - 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী' [সিলেট] থেকে প্রকাশিত।

৭. **অত্র গ্রন্থ**।

এছাড়া কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইতোমধ্যে তিনি রচনা করে প্রস্তুত করেছেন। এগুলো হলো:

১. 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'।
২. 'ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা'।
৩. 'আসুন ঘুরে দেখি সৌরজগৎ'।
৪. 'আউলিয়ায়ে চিশ্‌ত'।
৫. 'প্রেমের পথের অমৃত বাণী'।
৬. 'বিস্ময়কর মানবদেহ'।
৭. 'জীবন্ত কোষ: পরিচিতি ও কার্যকারিতা'।
৮. 'মহাবিশ্বের মহান মুসাফির'।
৯. 'হৃদয়ের প্রশান্তি জিকরুল্লাহ্'।
১০. 'ব্যবহারিক গণিত'।
১১. 'মানাযিলে মা'রিফাত'।

১২. 'এসো বিজ্ঞানের জগতে'।
১৩. 'এসো অঙ্ক শিখি'।
১৪. 'ছোটদের ভূগোল'।
১৫. 'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'।
১৬. 'মানতিকুত তায়ির [কাব্যানুবাদ]'।
১৭. 'ছোটদের পদার্থ বিজ্ঞান'
১৮. 'তিন ভাষার শব্দবই'।

বর্তমানে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত সিলেটের সুবিদবাজারস্থ **'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া'** গবেষণা বিভাগে জ্ঞানচর্চায় নিমজ্জিত আছেন। আমরা আশা করছি তাঁর রচিত মূল্যবান আরো কিছু গ্রন্থাদি অচিরেই প্রকাশ হবে। - প্রকাশক

যোগাযোগ: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, পো: ও জিলা: সিলেট, বাংলাদেশ।
E-mail: engineerazizulbari@gmail.com